ওঁতৎসৎ

হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী—২৬



শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

 [মূল্য ১।৵ পাঁচ সিকা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী।

১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত) (১ম সংস্করণ ১০০০) ১৩০০ সাল; ২য় সংস্করণ (ভাল বাঁধা সচিত্র ও বিস্তৃত সূচীসহ ৫০০) ১৩৩১ সাল।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ ১৩০১।

৩। অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ ১৩০২।

৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩০৩; (২য় সংস্করণ ৫০০) ১৩১৭।

৫। আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ১৩০৭।

৬। অভিব্যক্তিবাদ ১৩০৯।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি ১৩১৬।

৮। আলাপ ১৩১৭।

৯। আঁখিজল ১৩১৭।

১০। শ্রীভগবৎকথা (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩১৯। (২য় সং ৫০০) ১৩২৫; (৩য় সং ১০০০) ১৩৩১।

১১। ওঁ পিতা নোঽসি ১৩২১।

[গ্রন্থাবলীর অবশিষ্ট অংশ ॥৵০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]



৫৭ বৎসর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বয়সে

ভারতের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ
ঋষি, মুনি, পিতৃপুরুষ ও সাধু-
দিগের চরণে অর্ঘ্য-
উপহার।

কলিকাতা

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বা ।। মুদ্রিত ৬৮৮-৭০২৬ কলিগতাব্দে ১৯৮২ সম্বতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৮৪৭ শকে ১৩৩২ সালে ৯৬ ব্রাহ্মসম্বতে কর্কট রাশিস্থ ভাস্করে শ্রাবণ মাসে অষ্টাদশ দিবসে সোমবার শুক্লপক্ষে শুভ চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রকাশিত হইল ।.

ভূমিকা।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ "প্রভাতী"র ভূমিকা লেখা যেমন আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, তেমনি এই "সন্ধ্যায়" গ্রন্থেরও ভূমিকা লেখা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ভূমিকা লিখিবই বা কি? ভবসাগরের পরপারে যাইবার জন্য খেয়া নৌকার অপেক্ষায় আমি এপারে বসিয়া আছি। জীবনের এই সন্ধ্যাকালে বালুকাময় এই সংসারসাগরের তীরে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি—ভাবনাগুলি আসিতেছে আর চলিয়া যাইতেছে—কতকগুলি সন্ধ্যার শিশিরের মত মর্ম্মস্থল নীরবে স্পর্শ করিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছে; আর কতকগুলি অন্তরে সাগর-তরঙ্গের মত তালেতালে আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং তালে তালে ফিরিয়া যাইতেছে।

তন্মধ্যে যেগুলি অন্তরে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই কতকগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি—না করিয়া উপায় ছিল না—প্রাণ বাঁচিতেছিল না—সেইগুলি "সন্ধ্যায়" নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। এই সমস্ত চিন্তার কেন্দ্র হইল—Alone to the Alone—তিনি আর আমি। ইহার আর ভূমিকা লিখিব কি? যাঁহাদিগের চরণে বসিয়া ধ্যানস্থ হইতে শিখিয়াছি, তাঁহাদিগেরই চরণে ইহা পূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র।

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

অভিমত।

চিত্র সূচী।

হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর শেষাংশ। *

১২। প্রাণের কথা (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩২২; (২য় সংস্করণ ৫০০) ১৩২৬।

১৩। আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবনা (মূল্য ৵০ আনা ১৩২২।)

১৪। বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি ১৩২৩।

১৫। শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা ১৩২৩।

১৬। মা ১৩২৪।

১৭। মায়ে-পোয়ে ১৩২৫।

১৮। তোমরা আর আমরা ১৩২৬।

১৯। স্বস্তিকা ১৩২৬।

২০। জর্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি (মূল্য চারি আনা) ১৩২৭।

২১। ওপারে ১৩২৮।

২২। আর্ট ও সাহিত্য (রায় বাহাদুর দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত) ১৩২৯।

২৩। শান্তি (ভাল বাঁধা) ১৩৩০।

২৪। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি (ভাল বাঁধা) মূল্য ১৲ এক টাকা ১৩৩১।

২৫। প্রভাতী (ভাল বাঁধা) মূল্য ৸৹ আনা ১৩৩১।

* প্রাপ্তিস্থান—৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো—কলিকাতা।

সন্ধ্যায়।

ওঁতৎসৎ।

সন্ধ্যায়।

১। সাগরের আহ্বান।

তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া এই সন্ধ্যা-বেলায় মহাসাগরের তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পশ্চাতে মরুভূমির দিগন্ত-বিস্তৃত বালুরাশি ধূ—ধূ—পড়িয়া আছে। দক্ষিণে বামে সেই মরুভূমিরই দিগন্ত-বিস্তৃত বালুকারাশি চলিয়াছে। কেবল সম্মুখে—অসীম— অনন্ত— মহাসাগর। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই মহাসাগরের কি

ভীষণ রুদ্র মূর্ত্তি—কি হুহুঙ্কার! সূর্য্য অস্তাচলে ডুবুডুবু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই রুদ্র মূর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! সন্ধ্যার এই প্রাক্‌কালে এই মহাসাগরও যেন ধ্যানে বসিবার অবসর খুঁজিতেছে;—আর, ছোট ছোট ঢেউয়ের আঙ্গুল দিয়া আমাকেও যেন উহারই সঙ্গে একাসনে—যোগাসনে বসিবার জন্য আহ্বান করিতেছে!

ওঁ

২। সান্ধ্য তপনের খেলা।

সান্ধ্য তপনের রশ্মিরাজি আলোকের এক বিচিত্র চিত্রের সৃষ্টি করিতেছে! সূর্য্যদেব ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমেই নামিয়া চলিতেছেন। মহাপুরুষের ন্যায়, সূর্য্যদেব এই নামিবার সময়েও নিজের অস্তমিত মহিমার লোকসকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন! সূর্য্যদেবের সেই উজ্জ্বল অস্তমিত মহিমার দিকে তাকাইতে

পারাও যায় না ; আবার না তাকাইয়াও থাকা যায় না। যে অঞ্চল হইতে সূর্য্যদেব চলিয়া যাইতেছেন, সেই অঞ্চলেই কি-জানি কি-এক বিষাদের ঘন অন্ধকার নামিয়া জীবজন্তু সকলকেই আকুল করিয়া তুলিতেছে ! এধারে সূর্য্যদেবের সেই অস্তমিত মহিমারও আলোকে মহাসাগরের ছোট ছোট ঢেউগুলি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ঝলসিয়া উঠিতেছে ; আর ওধারে ঢেউগুলি নিরানন্দে ডুবিয়া নিজেদের আনন্দপূর্ণ গীতগান সমস্তই যেন ভুলিয়া গিয়াছে ! ঢেউয়ের সে নৃত্যই বা এখন কোথায় ! আনন্দোচ্ছ্বাসের সে কোলাহল-কলরবই বা কোথায় !

ও

৬। কাতর প্রার্থনা।

বেলা তো বহিয়া যাইতেছে। কি করিব—কি বলিব—কিছুই ভাবিয়া পাই না। কেবল বুঝিয়াছি, আমার হৃদয়ে কে একজন অতি নীরবে—অতি নিঃশব্দে আমাকে এই মহাসাগরের তীরে আসিতে বলিয়াছেন—তাই আসিয়াছি। প্রভু!—নাথ আমার—আজ বুঝিয়াছি, তোমারই সেই আহ্বান। কেন ডাকি-

য়াছ, কিছুই জানি না। তোমারই আগমনের পথ চাহিয়া চাহিয়া দিবানিশিই বসিয়া আছি। আজ তোমার চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিব—এ অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমার প্রাণের দেবতা তুমি! আমার প্রাণ যে দিবানিশি তোমাকেই চাহিতেছে। তোমার ছবি আমার হৃদয়ের পরতে পরতে আঁকিয়া লইয়াছি। তুমি তো দেখিতেছ, আমার প্রাণের ভিতর তোমার বিরহে কি রকম অশ্রুধারার উৎস ছুটিয়াছে—এই অশ্রুধারায় পাষাণও গলিয়া যায়;—নাথ! প্রভু! আজ তুমিও একটুখানি গলিয়া আমার হৃদয়কে ভাসাইয়া দাও—একটুখানি গলিয়া হৃদয়ে

নামিয়া এসো। আর পারি না প্রভু—আমাকে যদি তোমার বুকেতে টানিয়া না লও, তবে ঐ তোমার চরণতলেই চির-কাল পড়িয়া থাকিতে দাও।

ॐ

৪। শান্ত আনন্দ।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখনও নামে নাই। দিনের আলো এখনও নিভে নাই। আমার পশ্চাতে বালুরাশি কত দূর—বিস্তৃত পড়িয়া আছে। তাহারও পশ্চাতে—সুদূরে—এক প্রকাণ্ড বট-গাছ—জটাজুটধারী সমাধিস্থ মহাসন্ন্যাসীর মত অচল—অটল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বহিঃশরীরের পাতায়-

পাতায় ডালে-ডালে কত দাঁড়কাক, কত বাদুড়-পেচক, কত পশুপক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইতেছে এবং তাহাদের কিচির-মিচির শব্দে সেই অঞ্চলকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু—সেই বট-গাছ—অচল অটল মূর্ত্তিতে ধ্যানস্থ হইয়া আছে; তাহার অন্তরের শান্তি ঐ সমস্ত শতবিধ চীৎকারেও বিচলিত হই-তেছে না। আমারও অন্তর ধ্যানস্থ হইতে চাহিতেছে। সংসারের বিষয়-কোলাহল আর আমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। আমি এখন শান্তিসমু-দ্রের কোলে সমাধিস্থ হইতে চলিয়াছি। আমি আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছি। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আমার চক্ষু

এখন একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। সেখানে শান্ত—নীরব—সন্ধ্যার ছায়া পড়িতেছে। এখন আমি যে দিকেই দেখি—বাহিরে বা অন্তরে—দেখি—এক শান্ত—গম্ভীর—নিশ্চল আনন্দ। এই আনন্দকে কি বলিব জানি না—নির্বাত প্রদেশে অবিকম্পিত সুনিশ্চল দীপশিখার ন্যায়—এক স্থিরানন্দ আমার সমুদয় মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ॐ

৫। বিফল মনোরথ।

প্রভু! তুমি এ মোহন বাঁশী পাইলে কোথায়? তোমার ঐ মোহন বাঁশীর আহ্বান শুনিয়া আমার মন যে কোথায়—কোথায় গিয়াছে—তাহাকে তো আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমার ঐ বাঁশীর সুর যে একেবারে তানে তানে তানে গগনের পর গগন ছাইয়া ফেলিয়াছে। না—আর মনপ্রাণকে বাঁধিয়া

রাখিতে পারি না—বলিতে পারি না—হৃদয় যে কিভাবে তোমার চরণ স্পর্শ করিতে চায়; তাহা প্রাণের ভিতরেই বুঝিতে পারি—মুখে শত চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারি না। হৃদয়ের সে ধুকধুকি—যে না অনুভব করিয়াছে—তাহাকে বুঝাই বা কি প্রকারে? কিন্তু প্রভু! এ কি? তুমি ডাকিলে, আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিবার আশায় ছুটিয়া গেলাম—কিন্তু কৈ—পারিলাম না তো? ফিরিয়া আসিয়া এইখানে কত সুদীর্ঘকাল বসিয়া আছি—তীব্র আশায় ছুটিয়া গিয়া নিষ্ফল হইলে হৃদয় কিরূপ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা তো তুমি জান—তোমার চরণস্পর্শলাভে বিফলমনোরথ হইয়া যে

দিকেই দেখি, কেবলই অন্ধকার দেখি-তেছি। জননী! তোমার চরণস্পর্শ করিবার অধিকার না দিতে চাও, দিও না। কিন্তু আমার প্রাণে একবার তোমার চরণ রক্ষা কর—মনে করিলেও—আনন্দে ডুবিয়া যাই। দাও—এক-বার দাও জননী! একবার এই বুক চিরিয়া তোমার চরণের স্পর্শ অনুভব করিতে দাও। আমার চিরজীবনের আশা, আমার হৃদয়ের ভালবাসা সার্থক হউক; আমার জীবন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠুক।

৬। ঊর্দ্ধমুখী দৃষ্টি।

সন্ধ্যা নামিতেছে—ধীরে—অতি ধীরে। আমাদের শৈশবকালে দেখিয়াছি—এক-একটী সুবৃহৎ পরিবারের বৃদ্ধা গৃহিণী সন্ধ্যাবেলায় ধূপ-ধুনার গন্ধের মধ্যে বাড়ীর ছেলেপিলেকে আগলাইয়া বসিয়া কত ধর্ম্মকথা, কত সাধু কথা শুনাইতেন। মনে হইতেছে—ঐ বটবৃক্ষেরও অন্তঃর্যামী দেবতা নিজের পাতা, ডাল, ঝুরি

প্রভৃতি সকলকেই অন্তরের প্রেমের বলে কেমন সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। কেবল আপনার আত্মীয়স্বজনকে নহে, বাহিরের শত শত বিহগকুলকেও আবার আশ্রয় দিতেছেন—আত্ম-পর বলিয়া কোন-প্রকার বিকার দেখা যায় না! এই মধুর সন্ধ্যাবেলায় সেই শত শত বিহগকুল এই মহাবৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া আনন্দিত মনে বৃক্ষের অন্তর্যামী দেবতার গুণগানে ও জয়ধ্বনিতে সমস্ত দিকটাই মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। দেবতাও যেন তাহাদের প্রেমের আনন্দে গদগদ হইয়া উঠিতেছেন। মনে হইতেছে—আত্মীয়-স্বজনদিগের এবং আশ্রিতবর্গের প্রেম-স্পর্শে সমস্ত গাছটী হইতে আনন্দের

রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষদেবতার প্রেম একদিকে সমস্ত ধরণীতে পরিব্যাপ্ত হইতে চাহিতেছে; আবার, সমস্ত আকাশে ও সমস্ত বিশ্বে যিনি ব্যাপ্ত আছেন, সন্ধ্যার গোধূলির আলো-আঁধা-রের ভিতর যাঁহার অপরূপ রূপ প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার দিকেও বৃক্ষদেবতার ঊর্দ্ধমুখী দৃষ্টি স্থির আছে। আমারও অন্তরে এই প্রার্থনা জাগিতেছে—আমা-রও হৃদয়ের প্রেম যেন প্রত্যেক মানবে, ভগবানের সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থে সম-ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু আমার অন্তরের দৃষ্টি যেন ঊর্দ্ধমুখে বিশ্বদেবতারই অনিমেষ নয়নে সমসূত্রে নিবদ্ধ থাকে।

৭। অভেদ।

সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে—কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ নামে নাই। দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার এখনও ধরণীকে ঢাকে নাই। পাখীরা নিজেদের বাসায় ঢুকি-ঢুকি করিতেছে, কিন্তু এখনও ঢুকে নাই—এখনও তাহারা কিচির-মিচির লাগাইয়াছে। সেই কিচির-মিচির ভেদ করিয়া এক দাঁড়কাক

ডাকিয়া উঠিতেছে—কা—কা—কা। কি মিষ্ট—কি রহস্যময় ডাক! দাঁড়কাক অপেক্ষা কত শত পাখী সুন্দর শীষ দিতে পারে, গান গাহিতে পারে। কিন্তু তাহাদের গান খুবই মিষ্ট হইলেও তাহার মধ্যে কোথায় যেন এই পৃথিবীর ভাব লুকাইয়া থাকে; তাহাদের গান আমার প্রাণকে আকাশের দিকে অনেক দূর লইয়া চলিলেও শেষে এই পৃথিবীরই দিকে আনিয়া ফেলে। কিন্তু দাঁড়-কাকের ডাক—ইহার সমস্তটাই একটা গভীর রহস্যময়। এই ডাক পৃথিবীর শত কিচির-মিচির, সহস্র কোলাহল-কলরবের ভিতরেও আমাদের কানে ও-পারের সম্বাদ আনিয়া দেয়। ঐ রহস্যময় ডাক

কালপারাবার ভেদ করিয়া ও-পার আর এ-পারকে, ইহলোক আর পরলোককে এক অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। দাঁড়কাক যে ওপারের সম্বাদ-বাহী দূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—তাহা না হইলে সকল দেশেই দাঁড়-কাকের সঙ্গে ওপারের কোন-না-কোন সম্বন্ধের কাহিনী সংযুক্ত দেখা যায় কেন?

আমার প্রাণের দুয়ার এখনো ভেজানো আছে—সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয় নাই। তাই ওপারের দূত দাঁড়কাক আসিয়া আমার অন্তরে বারে-বারে ধাক্কা দিয়া বলিতেছে—খোল—খোল—খোল। খুলিব কি?—এই ডাকের ভিতর দিয়া

ওপারের যে মধুর ছবি প্রাণের ভিতর দেখিতেছি—একটী আঙ্গুলও নাড়িবার তো শক্তি নাই ;—কাজকর্ম্ম করিবার—চিন্তা করিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ;—নীরব—নিস্তব্ধ আমি! কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিতে পারিতেছি না, কিন্তু স্বর্গ-মর্ত্ত্য, আকাশ-পাতাল, সকল স্থানের সকল কালের সকল কাজের ভিতরেই যে আমি প্রবেশ করিয়া বসিয়াছি ;, আমার এই ক্ষুদ্র আত্মাতেই তো সমস্ত বিশ্বের প্রাণ কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বপতি, আর, ক্ষুদ্র কীট আমি—পিতামাতা, আর, সন্তান আমি—এক হইয়া গিয়াছি। ভেদ নাই—ভেদ নাই—কোথায় বা আমি—আর কোথায়

ব্বা তিনি—এক বিরাট—বিশাল—অভেদ রহিল পড়িয়া !

ॐ

৮। বিরহের ব্যথা।

প্রাণের ভিতর ক্রন্দন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কাহার জন্য কাঁদিতেছি ?—জানি না—বুঝি না; কান্নার বন্যা আসিতেছে—তাই কাঁদিতেছি ! কাহার বিরহব্যথা জাগিয়া উঠিয়া আজ প্রাণকে বড়ই অধীর করিয়া তুলিতেছে ? সহসা দাঁড়-কাক আবার ডাকিয়া উঠিল—কা—কা—কা ! 'কাহার বিরহ আজ প্রাণের

ভিতর ঘনীভূত হইয়া উঠিল? না—আর পারি না—অশ্রুর রুদ্ধ আবেগ আর রোধ করিয়া রাখিতে পারি না। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অশ্রুর বন্যা প্রাণের দুই কূল ছাপাইয়া ভাসাইয়া চলিয়া গেল।—দাঁড়কাককে বলিলাম—এখন তুমি যাও—আর বিরহব্যথা জাগাইও না—প্রাণকে তো আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না—আমার প্রতি একটুখানি দয়া কর—আমাকে একটু-খানি চুপ করিয়া থাকিতে দাও। দাঁড়-কাক উত্তর দিল—কা—কা—কা—দেখিতেছ না—যাঁহার বিরহে আজ তুমি সুখের ব্যথায় এত অধীর হইয়া উঠিয়া-ছিলে, তিনিই যে আজ ওপার-এপার

জুড়িয়া তোমার হৃদয়ের নিভৃততম কোণে আসিয়া বসিয়াছেন—তুমি ব্যথায় বড়ই কাতর হইয়াছিলে বলিয়া তাঁহাকে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখ নাই ; যাও—যাও—যাও—প্রাণের অন্তঃপুরে গিয়া দেখ—তোমার সখা, সুহৃৎ, তোমার পিতামাতা, তোমার জীবনসর্ব্বস্ব নিজের অরূপ রূপের জ্যোতিতে সেই অন্তঃপুর আলো করিয়া বসিয়া আছেন ! এই সম্বাদ আনিয়া দেয় বলিয়া দাঁড়কাকের ডাক আমার নিকট বড়ই আকুলতা-মাখা, বড়ই মিষ্ট লাগে।

ওঁ

৯। বিরহে মিলন।

না—না—আর তো থাকিতে পারি না—প্রাণের দুয়ার খুলিয়া যাউক। আজ আমার গৃহে পিতামাতা আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন—জগতবাসী আজ আমার সেই পিতামাতা—জীবনসর্ব্বস্বকে দেখিয়া যাউক। যাঁহার বিরহে সারা সন্ধ্যাবেলা কাঁদিয়া-কাটিয়া অধীর হইতেছিলাম—যাঁহার দেখা না পাওয়াতে

অশ্রুর বন্যা প্রাণের দুইকূল ভাসাইয়া দিয়া গেল—আজ তিনিই তো সন্ধ্যারই মত নীরবে—নিঃশব্দে—আসিয়া আমার অন্তর অধিকার করিয়া বসিলেন! কখন্ যে আসিলেন—কিছুই তো জানিতে পারি নাই! নাই বা জানিলাম—তিনি তো আসিয়াছেন—তাহাই আমার ভাল—আমি তো আর কিছুই চাহি না। তিনি যখন আসিয়াছেন—তখন বিরহের কোন কথাই মনে আনিতেই পারিতেছি না। তাঁহারই বিরহ যখন রহিল না, তখন তিনি যে সকল লোককে আমার আত্মীয়-স্বজন করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদেরই বা বিরহ থাকে কোথায়?—মনেই করিতে পারিতেছি না যে, কখনও কোন

আত্মীয়-স্বজন আমাকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া গিয়াছেন। ছাড়িয়া যাইবেন কি ?—ছাড়িয়া যাইবেন ?—কে ?—স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, সকলেই তো সঙ্গে সঙ্গেই আছেন; যখনই যাঁহাকে ডাকিতেছি, চাহিতেছি, তখনই তো তিনি সম্মুখে উপস্থিত! সকলেই তো আমার সমস্ত শুভ কার্য্যে প্রাণপণ সহায়তা করিতে উৎসুক! তখন বিরহ কোথায়?—বিচ্ছেদই বা কাহার ? বিরহ—বিচ্ছেদ ? —নাই—নাই। বিরহযন্ত্রণা—ওকথা শুনিতেই চাহি না। আজ আমার নিকট সকলই মধুর—সকলই মধুর! বিরহে মিলন! কি সুন্দর—কি আশ্চর্য্য! আজ পৃথিবী মধুময়! দিকসকল মধুময়!

ভূধরসাগর মধু ক্ষরণ করিতেছে! আমার প্রাণও আজ গগন-ভুবন ব্যাপ্ত করিয়া আনন্দে ফুকারিয়া কাঁদিতে চাহিতেছে—মিলনের মধ্যে বিরহে আকুল হইতেছে;—বিরহের মধ্যে মিলনের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

ও

১০। প্রেমের আহ্বান।

সমস্ত নীরব হইয়া আসিয়াছে—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম—সকল দিকই নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। পাখীরাও নীরব হইয়া গিয়াছে। ওপারের দূতও জানি না আবার কোন্ সুদূর অঞ্চলে ওপারের মধুময় বার্ত্তা বহন করিয়া চলিয়াছে। আমিও নীরবে বসিয়া আছি। ভাবিতেছি,—কিম্বা ভাবি নাই—জানি না।

কিন্তু প্রাণের ভিতর এই একটা ভাবনার অস্পষ্ট ছায়া মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে—জীবন তো শুকাইয়া গিয়াছে—সম্মুখে অনন্ত জীবনে ভরা অনন্ত মহাসাগর, আর পশ্চাতে মরুভূমি! এমন সময়ে ঐ সুদূর বটগাছ হইতে একটী ঘুঘু ডাকিয়া উঠিল—ঘু—উ—ঘু। ঘুঘু একটীবার ডাকিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতিধ্বনি আকুল হৃদয়ে দিকদিগন্ত হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই বটগাছের ঘুঘুরই কাছে আসিয়া সাড়া দিল—ঘু—উ—ঘু। ঘুঘু কেন যে একটীবার মাত্র ডাকিয়া উঠিল—ডাকিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল—কিছুই তো বুঝিলাম না। বাহিরের জগতের সেই ডাক, সেই প্রতিধ্বনি

থামিয়া গেল—কিন্তু আমার অন্তর্জগতে তো তাহা থামিল না। ঘুঘুর সেই কোমলকরুণ ডাক এবং ততোধিক কোমলকরুণ সেই প্রতিধ্বনি আমার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে বড়ই তোলপাড় খাইতে লাগিল।

দাঁড়কাক যখন আমার অন্তরে ধাক্কা দিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছিল—কা—কা—কা—, যখন সেই ডাকের ভিতর হইতে আমি ওপারের বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিলাম, তখন যেন হৃদয়ে একটা বল অনুভব করিয়াছিলাম—সমস্ত জগতের নীরব নিস্তব্ধ ভাব ভেদ করিয়া কি জানি কেমন একটা আত্মনির্ভরের ভাব অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আপনার উপর

নির্ভর করিয়া কোন কার্য্যে যে প্রবৃত্ত হইব মনে করিয়াছিলাম, তাহা নহে; তথাপি সেই ডাকেরই ভিতর যেন মরু-ভূমির বাসিন্দার উপযুক্ত একটা আত্ম-নির্ভরের ভাব অনুভব করিতেছিলাম। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রবল আত্মনির্ভরের ভাব, কর্ম্মফলের উপর উৎকট নির্ভরের ভাব দাঁড়কাকের প্রতি ডাকের সঙ্গে অন্তরে আসিয়া আঘাত করিতেছিল।

ঘুঘুর ডাকে তাহার বিপরীত ভাব অন্তরে জাগিয়া উঠে। ঘুঘুর ডাকে উপলব্ধি করি—মরুভূমির পশ্চাতেও স্নেহের প্রেমের শ্যামলতা আছে। মনে হইতেছে—একটী ক্ষুদ্র নীড়ে দুইটী ঘুঘু পাশাপাশি বসিয়া আছে, আর পর-

স্পরকে কতই প্রেমের আলিঙ্গন দিতেছে! হয় তো একটী ঘুঘুর প্রাণে প্রেমের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় সে সহসা ডাকিয়া উঠিয়াছিল। সেই ডাকটীর ভিতর কত সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই-তেছি—যেন গঙ্গাতীরে কোন্ এক শস্য-শ্যামল ভূমিখণ্ডের উপর বসিয়া আছি—আর দেখিতেছি—কোন্ সুদূর হিমালয় হইতে জাহ্নবী নদী প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়া ইমন-পূরবী সুরে আনন্দমনে গান গাহিতে গাহিতে কুলুকুলু ধ্বনিতে চলি-য়াছে—মহাসাগরের অঙ্গে অঙ্গে আপ-নাকে মিশাইতে! ঘুঘুর ডাকে প্রাণের ভিতর গার্হস্থ্য প্রেমেরই চিত্র বড় বেশী ফুটিয়া উঠে। হরপার্ব্বতী যে ভাবের

আদর্শ, অন্নপূর্ণা যে উদার প্রেমপূর্ণ সদাব্রতের পরাকাষ্ঠার চিত্র, ঘুঘুর ডাকে, কি জানি কেন, সেই ভাবটাই প্রাণের ভিতর তোলাপাড়া খাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইতে চাহে। প্রস্ফুটিত শতদল যেমন স্বীয় সুগন্ধে মধুকরকে আকর্ষণ করে, আমারও প্রেম সেইরূপ দিকদিগন্তে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া জগত-বাসীকে আকর্ষণ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছে।



১১। তিনি আর আমি।

সূর্য্য অস্তাচলে ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নীরবে—অতি নিঃশব্দ পদক্ষেপে সমস্ত আকাশ জুড়িয়া নামিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার চারিদিকে ঘিরিয়া আসিল। মাথার উপরে, দক্ষিণে বামে, পায়ের নীচে, সম্মুখে পশ্চাতে,—সকল দিকেই আমাকে অন্ধকারে ঘিরিয়া বসিয়াছে। এত অন্ধ-

কার যে কখন্ নামিয়া আসিল, কখন্ যে চুপি চুপি আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, আমি তো তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। কোথাও একটী শব্দ নাই। পাখীরাও নিজের নিজের বাসায় নীরব হইয়া গিয়াছে। বটবৃক্ষও নীরব ধ্যানের যোগাসনে বসিয়া গিয়াছে। বাদুড় চামচিকা প্রভৃতি দুএকটী নিশাচর প্রাণী এদিকে ওদিকে নিঃশব্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরও প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি—দু'একটী তারা ফুটি-ফুটি করিতেছে—আবার দুএকটী বা তারা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়াই আছি—চাহিয়াই আছি—

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত যে কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া গেল, জানিতেও পারিলাম না। ক্রমে হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল—চিত্তবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন আর নিজেরও সঙ্গে নিজের কথা চলিল না। সমস্তই নীরব—বাহিরেও নীরব, অন্তরেও নীরব—নীরবে নীরব—কেবল তিনি আর আমি—আমি আর তিনি। কথা নাই—কথা নাই—তাঁহাতে-আমাতে কেবলই চোখোচোখি—কেবলই ছোঁয়াছুঁয়ি। Alone to the Alone! তিনি আর আমি—আমি আর তিনি।

ওঁ

১২। স্বপ্ন বা প্রত্যক্ষ ?

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল—কতটা কাল যে এইভাবে চলিয়া গেল, কিছুই জানিতে পারি নাই। কোথায় বা ছিলাম—কি-ই বা দেখিলাম—সমস্ত বুঝিতেও পারি নাই—কিছুই বলিতেও পারি না। তবে কি স্বপ্নই দেখিতে-ছিলাম ? যদি বা স্বপ্নই দেখিয়া থাকি, তবে সে রকম স্বপ্ন দেখাও আমার

সৌভাগ্য। কি-ই সেই আনন্দ-মূর্ত্তি—কি-ই বা সেই অপরূপ জ্যোতি! কিছুই জানি না—কিছুই বুঝি না। কিন্তু কে যেন আমাকে নীরব অনাহত শব্দে বলিয়া গেল—যাঁহার দয়াতে জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্ষুঃ খুলিতে পারিয়াছ; যাঁহার কৃপায় এই বিশ্বজগতের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাও—ইনি যে সেই জননীর জননী—মহাজননী। সেই মহাজননীর যে অরূপ রূপের জ্যোতি দেখিলাম, তাহা কতই স্নিগ্ধ—কতই মধুর! সেই জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না। সেই জ্যোতির কি-এক আকর্ষণী শক্তি আছে—যতই দেখি, মনে হয় আরও দেখি, আরও দেখি। তাঁহার

সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে দেখিতে—কোথায়—কোন্ সাগরে যে ডুবিয়া গেলাম, তাহা কিছুই বুঝিলাম না। মনে হইল—মুখে কথা নাই—মনে কথা নাই—মনে হইল, কেবল অনিমেষ নয়নে তাঁহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া আছি। মনে হইল—আমি যেন এক নবজাত শিশুর আকারে সেই জননীর কোলে শুইয়া একমনে তাঁহার প্রেমপূর্ণ মুখখানি দেখিতেছি; আমার ছোট-ছোট হাত-পা খুবই নাড়িতেছি, আর তাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়া এক অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছি। তিনিও আমাকে সেই যে তাঁহার স্নেহময় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিলেন—এক

মুহূর্ত্তও—মুহূর্ত্তের এতটুকু অংশও—তিনি আমাকে ছাড়েন নাই। ইহা স্বপ্নই হৌক, অথবা সমাধির প্রত্যক্ষ অনুভবই হৌক—আমার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই, অবসর নাই। স্বপ্ন হইলে এই স্বপ্নের উপর দিয়া, আর প্রত্যক্ষ অনুভব হইলে এই প্রত্যক্ষ অনু-ভবের উপর দিয়াই যেন আমার জন্ম জন্ম কাটিয়া যায়।

১৩। অন্তঃপুরে।

সমাধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাহিরে চক্ষু খুলিয়া দেখি—সেই সন্ধ্যারই অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া আছে। ওরে আমার মন! সূর্য্যকিরণের সঙ্গে সাগর-ঢেউয়ের ঝিকিমিকি খেলা দেখা তো তোমার শেষ হইয়া গিয়াছে; আলোর সঙ্গে ছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখা তো তোমার শেষ হইয়া গিয়াছে—

তবে আঁর এখানে এখন বসিয়া কি হইবে ? দিগন্তপ্রসারিত অন্ধকারের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া এমন মধুর সন্ধ্যাবেলা কাটাইলে কি হইবে ? চল—এখন অন্তঃপুরে চল, ঘরের ভিতরে চল। অনেকটা সময় চলিয়া গিয়াছে বটে, তবু চল—অন্তঃপুরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবে চল ; চল, সেখানে মঙ্গলশঙ্খ বাজাইবে চল। সন্ধ্যামাণিক ফুল লও ; ভক্তিতুলসী হাতে লও ; প্রেমের চন্দন আর শ্রদ্ধার ধূপ লইয়া চল—প্রাণের ভিতর জগজ্জননীর আরতি লাগাইয়া দাও। মলয়পবন জগজ্জননীকে চামর-ব্যজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; মহা-সাগর তাহার ঢেউয়ের আঙ্গুল দিয়া

তাঁহার চরণ ধুইয়া দিতেছে। চল, জগজ্জননী হইতে আর দূরে থাকিও না। না—না—তাঁহার আর আমার মাঝখানে কোন বাধা রাখিব না; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনকালের মধ্যে কোন ভেদ, কোন বাধা থাকিতে দিব না।

ওঁ

১৪। নিন্দা ও প্রশংসা।

প্রাণারামের সঙ্গে—জগজ্জননীর সঙ্গে যখন এইভাবে দেখাদেখি ছোঁয়াছুঁয়ি চলে, লোকে বলে, তুমি আলস্যে কাল কাটাইতেছ! যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা বলুক—তুমি তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না। তুমি হাতের উপর হাত রাখিয়া আকাশ দেখ, তারা দেখ, চাঁদ দেখ, আর সাগর-ঢেউয়ের খেলা দেখ;

মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে গিয়া জগজ্জননীর চরণপূজা করিয়া এসো—যাহার যাহা বলিতে ইচ্ছা, সে তাহা বলুক। এই জগতে আলো-ছায়ারই খেলা চলিতেছে—আলো আর ছায়া আলোরই এপিঠ আর ওপিঠ। নিন্দা আর প্রশংসাও একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ—তখন নিন্দা আর প্রশংসা লইয়া আমার মাথা-ব্যথা করিবার কিছুই নাই। প্রশংসা আমাকে বাহিরে লইয়া যায়—ভগবানের হস্তের কারুকৌশল দেখাইতে লইয়া যায়। নিন্দা প্রহরীস্বরূপে দাঁড়াইয়া আমাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেয়—সেখানে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার চরণপূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

কোন্‌টী ভাল—নিন্দা না প্রশংসা ? যে যাহা বলিতে চাহে, বলিতে দাও—নিন্দাতেও তোমার ক্ষতি হইবে না, বরঞ্চ লাভই হইবে ; প্রশংসাতেও তোমার বিশেষ ক্ষতি দেখি না—তুমি যে প্রশংসার স্বরূপ জানিয়াছ !

১৫। জগজ্জননীর আরতি।

সমুদ্রের পরপার হইতে চাঁদ উঠি-তেছে। চন্দ্রমা স্বহস্তে তাঁহার মহা-প্রদীপ জ্বালাইয়া আজ জগজ্জননীর আর-তিতে যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়া-ছেন দেখিতেছি। চন্দ্রমার সঙ্গে মলয়-পবন ও সমুদ্রের বড়ই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি আছে বলিয়া মনে হয়। তাই চাঁদ উঠিতে না উঠিতেই মলয়পবনও

চন্দ্রমায় সঙ্গে জগজ্জননীর আরতিতে যোগ দিবার জন্য চামর ধারণ করিয়া উপস্থিত! মহাসাগরও উহাদের দেখা-দেখি আরতিক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য লালায়িত—তাই তাহারও প্রাণে আনন্দের ঢেউ দেখা দিয়াছে। মহাসাগর তুরী ভেরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য এক-সঙ্গে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। জয় মা জগজ্জননী—তোমার আরতি আজ যেন আমরা সকলে মিলিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারি।

ওঁ

১৬। সাগরে-চাঁদে খেলা।

চাঁদের সঙ্গে মহাসাগরের যেন একটু বেশী ঘনিষ্ঠভাব আছে দেখি। তাই চাঁদ উঠিতে না উঠিতে এমন শান্ত মহাসাগরেও আনন্দের তরঙ্গ উছলিত হইয়া উঠিতেছে। আবার চাঁদও নিজের সমস্ত হৃদয়খানি মহাসাগরের উদার প্রশস্ত বক্ষের উপর ঢালিয়া দিয়া একেবারে আহ্লাদে আটখানা—কুটিকুটি হইয়া

আনন্দের হাসি হাসিতেছে। মহাসাগরের সঙ্গে চাঁদের খেলাটা একবার দেখ! খেলা চলিতেছে—কে কাহাকে ধরিবে? কেহই কাহাকেও ধরিতে পারিতেছে না—ধরিতে পারিলেও ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। হায়-হায়! কোথায় গেল আমার সেই শান্ত নীরব ভাব? আমিও উহাদের খেলা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছি—মনে প্রাণে উহাদেরই সঙ্গে খেলিতে লাগিয়া গিয়াছি। ওরে মন! খেল—খেল—এই বেলা যাহা কিছু খেলিবার আছে, খেলিয়া লও। এ জগতের খেল্‌াই এইরূপ—সকলেই সকলকে ধরিতে চাহে—সকলকেই সকলেই ধরিব ধরিব করিয়া আগাইয়া যায়

বটে, কিন্তু—কেহই কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না।

—ওঁ—

১৭। প্রাণের কথা।

মা—জননী আমার—পিতা আমার—কবে সমস্ত সংসার ছাড়িয়া দিয়া তোমার চরণতলে বসিয়া থাকিবার অধিকার পাইব? পিতা আমার—জননী আমার—তুমি তো আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতেছ—বল পিতা—বল—কবে আমি সেই অধিকার লাভ করিব? কবে এই মহা কালপারাবারের বাধা

ছিন্ন করিয়া কালের অতীত মহাকাল তোমাকে আমার হৃদয়ে নিত্যকাল প্রেমের অচ্ছেদ্য তন্তু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে পারিব? আর না—দর্শনের ভেদাভেদ লইয়া তর্কবিচার আর শুনিতে পারি না—আমি চাই প্রেমের প্রস্ফুটিত শতদল—ফুটন্ত গোলাপ—গন্ধে গন্ধে দিকসকল আমোদিত করিয়া তুলিতে চাই; প্রেমের অদৃশ্য সূত্রে আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বাঁধিতে চাহি, আর জগজ্জননীর সঙ্গে তাঁহার এই ক্ষুদ্র সন্তানকে অটুট বাঁধনে বাঁধিতে চাহি। এই কুসুমকোমল প্রেমের বজ্রকঠোর বলে মৃত্যুর মরণ হউক।

১৮। প্রাণের দুয়ার খোলা।

প্রাণের দুয়ার আজ খুলিয়া রাখিয়াছি। আর আমি বিচার করিতে বসিব না—কে ভাল, আর কে মন্দ। আজ আমার প্রাণের ঘরে সবাই আসুক—যারে ভাল বলে, সে-ও আসুক; যারে মন্দ বলে, সে-ও আসুক। যাহার যতদিন আমার প্রাণে থাকিতে ইচ্ছা, সে ততদিন থাকুক। যাহার যবে ইচ্ছা, সে তবে চলিয়া

যাউক। ঘরের ভিতর বড় ধূলা বলিয়া আমার নিকট কেহ নালিশ করিও না। আমাকে একটুখানি শান্তিতে থাকিতে দাও। সংসারের ভাবনা, ধূলা পরিষ্কার করিবার ভাবনা যথেষ্ট ভাবিয়াছি—আর তো ভাবিতে পারি না। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, বিদ্যুৎ—সকলেরই জন্য আজ আমার প্রাণের গৃহকে অবারিত রাখিয়াছি। রৌদ্রের যদি ইচ্ছা হয়, সে নিজের তেজে ধূলাকে দগ্ধ করুক; বিদ্যুৎ যদি আসে—আসুক,—আসিয়া নিজের পুণ্যবলে, পাপকে পুণ্যে পরিণত করুক; ঝড় আসিবে—আসুক—প্রাণের গৃহে যাহা কিছু ধূলার অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা উড়াইয়া লইয়া যাক;

বৃষ্টি যদি আসে—আসুক—আসিয়া শান্তিজলের ধারা ঢালিয়া দিক। ইহারা যদি আবার প্রাণের ঘর পরিষ্কার করিবার জন্য না আসে—নাই বা আসিল; আমার প্রাণ অমনই অবারিত দুয়ার পড়িয়া থাক। আমার প্রাণে যদি ধূলিপঙ্ক আশ্রয় লইতে আসে—আসুক; আর যদি শুষ্ক ডাঙ্গায় সুগন্ধ পদ্ম ফুটিয়া উঠিতে চাহে—ফুটুক। মেঘের ঘন অন্ধকার যদি আমার প্রাণকে ঢাকিয়া ফেলিতে চাহে, তো ঢাকিয়া ফেলুক; সূর্য্যের প্রখর উজ্জ্বল আলো যদি আমার নগ্ন প্রাণের কদর্য্যতা প্রকাশ করিতে চাহে তো করুক। আমি আমার প্রাণের দুয়ার বন্ধ করিতে পারিব না। আমি

কাহাকেও ডাকিব না ; আমি কাহাকে নিষেধও করিব না আসিতে। কে আসিবে এস—আমার প্রাণের ভিতরে হাসির মদিরা যদি ঢালিয়া দিতে চাও—ঢালিয়া দাও। কে আসিবে এস—আমার প্রাণে দুদণ্ড বসিয়া অশ্রু ফেলিয়া যদি শান্তি লাভ করিতে চাও—অশ্রু ফেল। আমার নিকট ভালও ভাল ; আমার নিকট মন্দও ভাল। ধনীও আমার, নির্ধনও আমার ; পুণ্যবানও আমার, পাপীও আমার ; রাজরাজেশ্বরও আমার, পথের কাঙ্গা-লও আমার। সবাই আমাতে, আমিও সবাতে। সকলই মঙ্গলে, মঙ্গল সকলে। জয় শিব-সত্য-সনাতন—জয় শিব-সত্য-

সনাতন! আজ আমি ধন্য—আমি ধন্য।



১৯। পিতৃদেবের স্মরণে।

পিতা আমার!—পিতা আমার!

এমনই এক সন্ধ্যাবেলা একদিন প্রাণের ভিতর কি জানি কোন্ দুঃখের বড়ই আবেগ আসিয়াছিল। সময় কাটাইবার জন্য এক বন্ধুর সঙ্গে প্ল্যান্‌চেট ধরিয়া বসিলাম। পিতা! কি জানি কেন, কতকাল'পরে—কত বৎসর পরে তোমার চরণে প্রাণ আছড়াইয়া পড়িল। মনে



৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে প্রার্থনা করিলাম—তোমার নিকটে শত অপরাধে অপরাধী আছি—আমার সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। মনের কথা পিতা তুমিই জানিতে। বন্ধুকেও বলি নাই—তোমার নিকট ক্ষমাভিক্ষার কথা তো ইতিপূর্ব্বে মনেই আসে নাই। কাগজে অনেক হিজিবিজি অঙ্কিত হইল। আমি তাহার একটী অংশও পড়িতেও পারিলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি কথা বাহির হইল? বন্ধুটী তৎক্ষণাৎ পড়িয়া বলিলেন—"পিতার নিকট সন্তানের আবার দোষ কি?" তখন মনে হইল—সেই লেখার মধ্যে দুএকটা অক্ষরে তোমার হাতের ছাপ আছে! পিতা!

তোমার সেই স্নেহপূর্ণ ক্ষমাবাণী আজও আমার কানে দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে। আজ এই সন্ধ্যার অন্ধকারে তোমার সেই মধুময় বাণী আমার হৃদয়ে কত অপরাধের কথা, কত ক্ষমার কথা, তোমার কত মঙ্গলময় উপদেশের কথা জাগাইয়া তুলিতেছে। পিতা! অশরীরী তুমি! আমার মর্ম্মব্যথা স্পষ্ট দেখিতেছ। আমাকে ক্ষমা করিয়াছ জানি—আমার এই মর্ম্মব্যথা দূর করিয়া শান্তি দাও। আমার হৃদয় ধক-ধক কাঁপিতেছে—দুই নয়নে অশ্রুধারা অবিশ্রাম ঝরিতেছে—আর পারি না—পিতা রক্ষা কর।

ওঁ



৺নীপময়ী দেবী

২০। মাতৃদেবীর স্মরণে।

মা আমার! জননী আমার! আজ বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে—তুমি আমাদিগকে ইহলোকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছ। দুঃখে শোকে রোগে বিপদে, প্রাণ যে মা আজও তোমারই কাছে ছুটিয়া যাইতে চায়;—তোমারই সেই স্নেহমাখা কোলে একটুখানি—একটীবার—মাথা রাখিয়া শুইবার জন্য

প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়া উঠে। মাথার শিয়রে বসিয়া যেমনভাবে কপালে হাত দিয়া আমার সমস্ত ভয়ভাবনা, সমস্ত রোগশোক কি আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে তাড়াইয়া দিতে, তেমনিভাবে তোমার সেই মঙ্গলহস্তের স্পর্শ অনুভব করিবার জন্য প্রাণ যে আঁকুবাঁকু করিতে থাকে। কিন্তু তুমি ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছ, তাই নাকি আর তোমাকে পূর্ব্বের মত ডাকিবার অধিকার নাই; তোমার কোলে শুইয়া আছি বলিলে নাকি প্রমাণ হয় যে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে! তাহা হউক। মা—জননী আমার! আজ এই সন্ধ্যাবেলায়, আমার প্রাণে যে দুঃখ উদ্বেলিত হইয়া উঠি-

তেছে। এ দুঃখ কাহাকেও যে জানাইতে পারিতেছি না—এ দুঃখ তুমি ছাড়া আর যে কেহই বুঝিতেই পারিবে না। মনে পড়ে—তোমাকে কতই কষ্ট দিয়াছি, কতই দুঃখ দিয়াছি। উঃ—মনে করিলেও হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যায়! এত দুঃখ, এত কষ্ট দিলেও এক দিনেরও জন্য তো তোমার স্নেহ হইতে এতটুকু বঞ্চিত হই নাই। মা—মা—আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমাকে গর্ভে ধারণ করিবার কালে তোমার সঙ্গে আমার যে নাড়ীর যোগ হইয়াছিল—সে নাড়ীর যোগ তো কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। তোমার সঙ্গে সেই অনন্ত-কালের যোগের বলে এইটুকু চাহি যে,

তোমাকে আবার সেই ছেলেবেলার মত মা বলিয়া ডাকিবার অধিকার আমাকে দাও। তুমি জান—তোমাকে বিরক্ত করিবার মধ্যেও, তোমাকে দুঃখ কষ্ট দিবার মধ্যেও, আমি তোমাকে কত ভাল বাসিতাম—আর এখনও তোমাকে কত ভাল বাসি। সেই ভালবাসার অধি-কার লইয়া আজ তোমার নিকট আমার শত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি-তেছি। তুমি আমার এই প্রার্থনা নিশ্চ-য়ই শুনিতে পাইতেছ আমি জানি। তাহা না হইলে আজ এই সন্ধ্যাবেলায় আমার সমুদয় মনপ্রাণ জুড়িয়া আসন পাতিয়া তোমার বসিবার দরকার কি ছিল—আর কেনই বা তুমি আমার

মাথাটী এখন কোলে লইয়া বসিলে ? মা—এ সংসারে আমার কে-ই বা আছে ?—প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবার কাহাকেও পাই না। মনে করিলাম—ইহাকে ভালবাসি, উহাকে ভালবাসি—কিন্তু—না—আমার প্রাণের দুঃখ কাহা-কেও বলিতে সাহস করিলাম না ; যত-টুকু বা বলিতে সাহস করিয়াছি—কৈ—তাহাও তো কেহ বুঝিতে পারিল না—প্রাণ দিয়া বুঝিবার চেষ্টাও করিল না ? যতদিন তুমি ইহলোকে ছিলে, ততদিন বরাবরই দেখিয়াছি যে, সুখের সময়ে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে দেখিতে না পাইলেও, দুঃখকষ্ট একটুকু পাইলেই, তুমি তোমার সমুদয় হৃদয়

লইয়া আমার প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিতে—এবং আমাকে তোমার স্নেহ-ভালবাসার রক্ষাকবচে কি আশ্চর্য্যরকমে রক্ষা করিতে! আজ তুমি ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছ—কিন্তু আমি যে প্রত্যক্ষ করিতেছি—তুমি আমার অন্তরে বসিয়া থাকিয়া আমার ভয়বিপদে বর্মদুর্গ হইয়া আছ! তোমাকে সেই যে আলিঙ্গন করিতাম—তুমি সেই যে আমাকে আদর করিতে—সে আলিঙ্গন, সে আদর আমার কালপারাবারে চলিবার পথে অনন্তকালের সঙ্গী। তোমার গাত্রের সেই পবিত্র স্নেহের গন্ধ আমার অনন্ত কালের পাথেয়। মা—এবার আমাকে তোমার বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আশী-

র্ব্বাদ কর—যেন জন্ম-জন্ম আমি তোমা-রই সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি।



২১। মৃত্যু।

মৃত্যু!—মৃত্যুর নামে লোকে কেন এত ভয় পায় জানি না। মৃত্যু তো অমৃতেরই ছায়া—অমৃতেরই এক পিঠ অমৃত, অপর পিঠ মৃত্যু। কোন সাধক-প্রবর সোনা আর মাটির ঢেলা উভয়কে সমদৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যাস করিবার জন্য একটুকরা সোনা আর একটুকরা ঢেলা হাতে লইয়া খুব তাড়াতাড়ি নাড়া-

চাড়া করিতেন। তাহার ফলে ঐ তুই-টার মধ্যে কোন্‌টা যে কি, তাহা বুঝি-বার শক্তি তাঁহার থাকিত না—কোন্‌টা কি বুঝিতে না পারিবার কারণে উভ-য়েরই প্রতি একটা সমদৃষ্টির ভাব আসিত। সেইরকম আমরাও যদি প্রাণের ভিতর মৃত্যু আর অমৃতকে সর্ব্ব-দাই উণ্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখি, তাহা হইলে আর মৃত্যুকে দেখিয়া ভয় পাইতে হয় না। মৃত্যু বলে—এই জগত মায়া—ইহার কোনও বন্ধন নাই; অমৃত বলে—এই জগত সত্য—ইহার অণুতে অণুতে প্রেমের বাঁধন। কিন্তু এই তুইটাকে উণ্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখ—দেখিবে তুই ই ঠিক। জগতের সঙ্গে বেশী বাঁধন

করিতে গেলেই দেখিবে—এ সমস্তই মায়া—বাঁধন ধরিবে না। জগতের সঙ্গে বাঁধন কম করিলে, বড়ই আশ্চর্য্য, দেখিবে যে, সমস্ত সংসারই প্রেমের বাঁধনে বাঁধা—সমস্ত সংসারই সত্যমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে; সমস্ত সংসারের ভিতর দিয়া প্রেমের অমৃতধারা নিত্যই প্রতি মুহূর্ত্তই ঝরিয়া আমাদের হৃদয়-মন সিক্ত করিতেছে। অমৃতও যেমন আমার বন্ধু, মরণও তেমনই আমার বন্ধু। মৃত্যু সংসারে না থাকিলে অমৃতের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িত কিপ্রকারে? মৃত্যু যখন সেই ধ্রুবতারা, নয়নের তারা, আঁধারের আলোককে স্পষ্ট দেখাইয়া দেয়, তখন মৃত্যুকে বন্ধু না বলিব কেন?

প্রভু! জীবনের নাথ তুমি! যখন ইহলোকের কর্ম্ম শেষ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, তখন মৃত্যুকে ধরিয়া যেন তোমার অমৃতচরণে পৌঁছিতে পারি—এইটুকু ভিক্ষা সফল কর—এই-টুকু আশীর্ব্বাদ দাও।

ॐ

২২। মরণে-জীবনে প্রেমলীলা।

তারাতে তারাতে প্রেমের চাহনি চলিয়াছে। আকাশে সাগরে প্রেমের আলিঙ্গন চলিয়াছে। ধরণীর সঙ্গে মহা-সাগরের প্রেমপূর্ণ কথোপকথন চলি-তেছে। আমারও সঙ্গে আমার প্রাণের দেবতার প্রেমের বাঁধন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই প্রকৃতি—ইহা তো তাঁহা হইতেই নিশ্বসিত—এই প্রকৃতিরও

অণু-পরমাণুর সঙ্গে আমার প্রেমের বাঁধন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারই ইঙ্গিতে তো আজ তাঁহারই চন্দ্র আমার গাত্রে জ্যোৎস্নাধারা ঢালিয়া দিতেছে—কি মধুর—কি মধুর—সত্যই এই জ্যোৎস্নাধারায় আজ আমি সেই প্রাণের দেবতারই প্রত্যক্ষ স্পর্শ অনুভব করিতেছি। ঐ যে সুনীল আকাশে অগণ্য অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র আমারই প্রাণের দেবতার আনন্দের কণাটুকু লইয়া একেবারে দিকে দিকে আনন্দ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছে—আমি যতই দেখি—যতই দেখি—আমারও হৃদয় যে আনন্দে ফাটিয়া-ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। চক্ষু খুলিয়া দেখি—সত্যই দেখি—তাঁহার

মঙ্গল হস্ত পাতায় পাতায়, প্রতি বালুকণায়, প্রকৃতির প্রত্যেক অণুপর-মাণুতে। কান পাতিয়া শুনি—মানবের প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক সঙ্গীতে তাঁহারই তো মঙ্গলবাণী শুনিতে পাই—তাঁহার মঙ্গলবাণী ব্যতীত আর তো কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। যাহা কিছু জানিতেছি—যাহা কিছু করিতেছি—সকলের ভিতর দিয়াই আমার চিত্ত-কমলে অধিষ্ঠিত সেই জগজ্জননীকেই জানিতেছি—অঙ্গে অঙ্গে তাঁহারই স্পর্শ লাভ করিতেছি। ভাবিতে ভাবিতে আর যে পারি না—প্রাণ একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠে—যে জগজ্জননীর ইঙ্গিতে তাঁহারই নিশ্বসিত এই ব্রহ্মচক্র

অবলীলাক্রমে চলিতেছে, আমার মত এক ক্ষুদ্র কীট—সে-ও তাঁহাকে স্পর্শ করিবার অধিকার পাইয়াছে! আমার চতুর্দ্দিকে মৃত্যু—সম্মুখে মৃত্যু, পশ্চাতে মৃত্যু, দক্ষিণে মৃত্যু, বামে মৃত্যু—সেই মৃত্যুর মাঝে উপবিষ্ট আমি—আমি অমৃতের স্পর্শ লাভের অধিকারী! মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের এ কি বিচিত্র যোগ—মৃত্যু-অমৃতে এ কি অনন্যপূর্ব্ব প্রেমলীলা!

ওঁ

২৩। রতীন্দ্রের স্মরণে।

স্নেহের পুতলি আমার ! এস তুমি—একবার এস ! এই বুক পুড়িয়া গিয়াছে—তোমার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের ঘাটে আমারও এই বুক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তাহা হউক—আজ এই দগ্ধ বুকের উপরেই তুমি এস—এস—একবার তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি—প্রাণটা শীতল হউক। তুমি



৺ ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন জীবিত ছিলে, তখন তো একদিনও এমন ভাবে গাঢ় আলিঙ্গন পাইবার জন্য প্রাণ উৎসুক হয় নাই। কে যেন আজ বলিয়া দিতেছে—আমার সেই স্নেহের ধন বারেক আমার বুকের উপর মাথা রাখিতে চায়। রাখ—বাছা—রাখ।

তাহার জীবনকালে তাহাকে কত অন্যায় শাস্তি দিয়াছি—তাহার প্রাণের কথা না বুঝিয়া তাহার উপর কত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি—আজ আমি তাহার জন্য যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করিতেছি। তাহার মনটা একেবারে খাঁটি সোনা ছিল। তাহার বয়স হইল মোটে এগারো বৎসর—ইহার মধ্যেই সে সহ-

পাঠীগণকে জগজ্জননীর উপাসনা করা শিক্ষা দিত! হায়—হায়! মৃত্যুর পূর্ব্বে একথা জানিলাম না কেন? এ কথা সে নিজমুখে একদিনও বলে নাই! তাঁহার চরণে তাহার প্রাণটা বাঁধা পড়িয়াছিল। কেনই বা সে আসিল, আর কেনই বা চলিয়া গেল—কিছুই তো বুঝিলাম না। এই রকম ঘটনা দেখিয়াই তো—হে জগজ্জননী!—তোমার মঙ্গল-ভাবে লোকেরা সন্দিহান হইয়া উঠে। না—না—আমি তোমার মঙ্গলভাবে সন্দিহান হইতে পারি না—আমি যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তুমি আমার দয়াময় পিতা—তুমি আমার করুণাময়ী মাতা। আমার ছেলে তোমারই তো কোলে

আছে—থাক্। আমার কাছে সে যত সুখে থাকিত, তোমার কাছে তাহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক বেশী সুখে থাকিবে। আমি আজ বুঝিয়াছি—কেন সে আসিল আর চলিয়া গেল। সে চলিয়া গিয়াই আমাকে প্রেমের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া গেল। তাহার মৃত্যু আজ আমার নিকটে ওপার আর এপারকে এক করিয়া দিয়াছে। সে এখানে থাকিতে তাহাকে কি-ই বা ভাল বাসিতাম? আর এখন—মনে করিলেই যে তাহাকে প্রেমের টানে টানিয়া আনি! আমিও বুঝিতে পারি যে,—সে-ও আমার ভালবাসা বুঝিয়া আমার কাছে আসিতে ভাল বাসে। যখন তাহার প্রেমে প্রাণ

ভরিয়া উঠিল—তখন কিন্তু তাহাকে এখানে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না !

—ওঁ—

২৪। প্রাণের গান।

আমি একা—তুমি আর আমি—আমি আর তুমি। নাথ! প্রভু! আজ আমার হৃদয়ের প্রত্যেক পরমাণু হইতে তোমার নামের কি যে অপূর্ব্ব গান উঠিতেছে—আমি শুনিতেছি,—আর আমি নিজেই মুগ্ধ হইতেছি। উঠিতেছে—আবার মিলাইয়া যাইতেছে। একটুকু শেষ রেশ প্রাণের ভিতর থাকিয়া যাইতেছে—

তাহাতেই আমার প্রাণ মুগ্ধ। সেই রেশের ভিতর দিয়া বিশ্বপ্রেমের এক নিত্য ঝঙ্কার অহর্নিশি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সেই রেশের ভিতর দিয়াই বুঝিতেছি—তোমারই আদেশে অযুত-কোটী গ্রহতারা মহাশূন্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, তোমারই নিয়মে লক্ষ লক্ষ রবিচন্দ্র কোথায়—কোন্ অদৃশ্য জগত-রচনার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে! এস—এস—প্রভু—আমার এই শোকতাপে দগ্ধমলিন হৃদয়ে তুমি তোমার অরূপ রূপে দেখা দাও—তোমার মঙ্গল হস্তের স্পর্শে শোকতাপ দুঃখভয় সকলই মুছিয়া যাক। আমি সংসারকে ছাড়িলে কি হইবে?—সংসার যে আমাকে ছাড়ে না।

না—না—আর না—জীবনটা যাক ভাসিয়া—দেখি কোথায় যায়। তোমার চরণ ছাড়া তো তাহার আর কোন গতি নাই—যাক—ভাসিতে ভাসিতে নানা আঘাত খাইয়া তোমারই চরণতলে গিয়া আশ্রয় লউক। তুমি পিতা—তুমি মাতা—আমি তোমার ক্ষুদ্র সন্তান—এইটুকু দেখো—জীবনটাকে ডুবিতে দিও না।

২৫। ওপারে।

দিনের যেমন সন্ধ্যা আসিয়াছে, আমার জীবনেরও তেমনই সন্ধ্যা আসিয়াছে। দিনের বেলায় যে সমস্ত জেলিয়ারা সাহসে ভর করিয়া এমন নিরাপদ উপকূল ছাড়িয়া মহাসাগরের ঢেউ খাইতে খাইতে কতদূর চলিয়া গিয়াছিল—তাহারা এখন আঁধারের ভয়ে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমি আর আমার

জীবনতরীকে ধরিয়াও রাখিব না—কিম্বা তাহাকে ফিরাইয়াও আনিব না। আমার জীবনতরী ঐ—অনন্ত মহাসাগরে ভাসিয়া যাইতে চায়—যাক ভাসিয়া। দেখি, সে কোথায় যায়—কোন্ অসীম অজানা দেশে ভাসিয়া যায়। এপারে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘিরিয়া ফেলিয়াছে বটে—কিন্তু ওপারে—ঐ—কি উজ্জ্বল আলো—ঘরে ঘরে যেন আলো ফুটিয়া বাহির হইতেছে! শুনিয়াছি—ওপারেই নাকি মায়ের সুস-জ্জিত গৃহ আছে। বাতাসও তো দেখি-তেছি—এপার হইতে ওপারের দিকে—উপকূল হইতে মহাসাগরের দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। ভাল—আমিও এক কাজ করি—আমারও এই নৌকাতে পাল

তুলিয়া দিয়া বসিয়া থাকি—হালও ধরিব না—দাঁড়ও বাহিব না—দেখি আমার এই জীর্ণতরী কোথায় গিয়া উঠে—ওপারেতে যাইবার হয়, যাউক—আর যদি পথের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তাহাই হউক—আমি আর উহাকে আটকাইয়া রাখিব না ;—আমি আর প্রাণের হাহুতাশ লইয়া চলিতে পারি না—বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি নোঙ্গর দড়ি—যাহা কিছু চলিবার পথে বাধা হইতে পারে, সমস্তই তীরে ফেলিয়া রাখিলাম। আমায় আর তোমরা ভয় দেখাইতে পারিবে না—তোমরা ফিরিতে বলিলেও আর ফিরব না—ভাসিয়াছি তো ভাসিতেই, দাও—ঐ অনন্তের মহা-

ক্রোড়ে কেমন নির্ভয়ে শুইয়া চলিব। নীচে অনন্ত মহাসাগর—মাথার উপরে অনন্ত মহাব্যোম। অসীম—অনন্ত—আশে—পাশে—উপরে—নীচে। আর না—আর কোন বাধা নাই। সংসারের কাছে আজ বিদায় লইলাম। সংসারের ছোট-খাটো নালিস শুনিতে শুনিতে জীবনের শেষ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—আর তাহা শুনিতে পারিও না—শুনিতে চাহিও না। এখন সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া অনন্তের মহাসাগরে যাত্রা করিতে চলিয়াছি। আজ আমার জীবনে অসীম আনন্দ! সংসারে যে কেহ আত্মীয় বলিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে চাও—তোমাদের সকলকে আমার প্রাণের

শেষ আলিঙ্গন দিতেছি—তোমরাও একবার প্রাণমন খুলিয়া আনন্দের উলুধ্বনি দাও—এই মহাসাগরের মহাতরঙ্গের গর্জ্জনকেও তাহা ছাড়াইয়া উঠুক—মহাব্যোমে তাহা প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি উঠাইতে থাকুক—আমিও একবার প্রাণ খুলিয়া "হরি হরি" বলি।



২৬। শুষ্ক জীবন।

প্রাণারাম—প্রাণেশ্বর! জীবন আমার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—পাতাগুলি একে-একে সমস্তই ঝরিয়া গিয়াছে—মহা-শ্মশানের মাঝে আমি একখানি শুষ্ক ডালের মত দাঁড়াইয়া আছি। প্রাণের মাঝে আর সেই সুকোমল কচি কচি সবুজ পাতাও ফুটে না—সেই সমস্ত কচি কচি পাতার উপর দিয়া মলয়

বাতাসও বহিয়া যায় না ; পূর্ব্বের মত রাশি রাশি ফুলও ফুটে না—চারিদিকে সুগন্ধও বাহির হয় না—ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল আর প্রাণের কাছে গান গাহিয়াও যায় না। প্রকৃতি যতই কেন হাসুক—সে হাসি প্রাণের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কোথায় যেন মিলাইয়া যায়! প্রভাতের কনকতপন সমস্ত পূর্ব্বদিক রাঙ্গাইয়া মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিতে খেলিতে যখন হাসিয়া গড়াগড়ি দেয়—পূর্ব্বে এই খেলা দেখিলে প্রাণটা কেমন লাফাইয়া উঠিত!—কিন্তু আজ—সে হাসি প্রাণের দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া শুষ্ক জীবন দেখিয়া নিরানন্দের গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে

ফিরিয়া যায়। মৃত্যুর বাতাস যেন আমার গায়ে গায়ে লাগিয়া গিয়াছে—প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছি—কবে সংসার আমাকে ছাড়িবে—কবে আমি মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুদণ্ড নিশ্চিন্ত মনে ভাবনাশূন্য প্রাণে ঘুমাইয়া বাঁচিব—কবে আবার কোন্ শুভ প্রভাতে জননীর স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া নববলে বলীয়ান হইয়া সরস-নবীন প্রাণ লইয়া জাগিয়া উঠিব।

২৭। গান আর আসে না।

জননী! তুমি আমার গান শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতে—ছেলেবেলায় যখন যাহা মনে আসিত, তাহাই প্রাণ খুলিয়া গাহিতাম—আর তুমি বলিতে, তাহাই খুব ভাল হইয়াছে, আর তোমার তাহাই ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু এ—কি? যতই তোমার কাছে আগাইয়া যাইতে চাহিতেছি, ততই যেন আমার

হৃদয়ের গান ক্রমশই নীরব হইয়া আসিতেছে—গান যেন আর প্রাণে জাগিতেই চাহে না! প্রতিদিন যেমন চাঁদ উঠে, আজও তো সেই চাঁদ তেমনই উঠিয়াছে—উঠিয়া গগনভুবনকে জ্যোৎস্নাধবলিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ঐ চাঁদ ওঠা দেখিয়া প্রাণের ভিতর যে সঙ্গীত তোলপাড় খাইত—আজ সে সঙ্গীত কোথায়? ঐ সুনীল গগনের তারাগুলি যেমন ভাবে—যে আকুল নয়নে চাহিত এবং আমার দুই নয়ন হইতে অশ্রুধারা টানিয়া বাহির করিত, আজও তো তারাগুলি তেমনই ভাবে—সেই আকুল নয়নেই চাহিতেছে—কিন্তু আমার প্রাণের সেই করুণ সঙ্গীতই বা

কোথায়, আর সেই অশ্রুধারাই বা কোথায় ? নয়নের ধারাও শুকাইয়া গিয়াছে, প্রাণের সঙ্গীতও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ! রজনী নিস্তব্ধ—। মহাসাগর অবিশ্রামে নিজের মহাপ্রাণের উপযুক্ত মহাসঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছে ; দূর—অতি দূর পল্লীগ্রাম হইতে দুএকটী বাঁশীর ভাঙ্গা তানে পল্লীবাসীদের কত-নাপ্রাণের সঙ্গীত ভাসিয়া আসিয়া কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতেছে—আর এই শান্তির মধ্যেও কেমন এক মধুর অশান্তি আনয়ন করিতেছে ! মলয় বাতাস কি জানি কিসের জন্য, কাহার দুঃখে উদাসপ্রাণে করুণগীতি গাহিয়া চলিয়াছে ! কেবল আমারই প্রাণে গান

আর আসে না—কেন ? প্রাণেশ্বর ! দাও—দাও—আমার প্রাণের বোঝা তুমি নামাইয়া দাও—প্রাণের ভিতর আবার সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়া উঠুক— প্রাণের ভিতর যুঁই বেল প্রভৃতি সন্ধ্যার সুরভি কুসুম ফুটিয়া উঠুক—আর আমাকে তাহাদের সুগন্ধে পাগল করিয়া তুলুক।

২৮। দাদার স্মরণে।

দাদা! নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক দাদা! এই ধরণীতে তোমার যাহা কিছু কাজ ছিল, সকলই কি ফুরাইয়া গেল? না হয় ফুরাইয়াই গিয়াছিল—দুদণ্ড কি বিশ্রাম করিতেও পারিলে না? বিশ্রাম-স্থানের সন্ধানে গিয়াছিলে—জননী বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার প্রকৃতিরাজ্যে বিশ্রা-মের অবসর নাই। কি কাল-ব্যাধি



৺ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লইয়া আসিলে—সাত দিন যাইতে না যাইতে আমাদের সকলকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলে! তোমার প্রাণের উৎস হইতে সঙ্গীতের যে প্রবল ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, বোধ হয় এই ধরণী সেই সঙ্গীতধারা ধারণ করিবার উপযুক্ত হয় নাই—এটী তুমি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলে; তাই বোধ হয় তুমি দেবতাদের সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে সমস্ত গগন ভরিয়া আনন্দধ্বনি জাগাইবার জন্য অনায়াসে ওলোকে প্রস্থান করিলে—আমাদের দিকে একবার তাকাইলেও না। তোমার নির্ম্মল দেহে রোগের এত যন্ত্রণা আসিল কেন?—মনে করিতেও প্রাণ যে ভাঙ্গিয়া যায়! তুমি যে রোগ-

শোকের হাত এড়াইয়া গিয়াছ—ইহাই যথেষ্ট। আমরা এখানে সংসারের মায়ামোহে পড়িয়া কিরকম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহা তো আজ তুমি অশরীরী অবস্থায় বুঝিতেই পারিতেছ! তোমাকে এলোকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টাই করিলাম—কিন্তু তুমি থাকিবে কেন? অন্য কোন্ সুরপুরে তোমার দিব্য সঙ্গীত শুনাইবার যে ডাক আসিয়াছিল! আমাদের প্রাণের অশ্রু যদি তোমার প্রাণে ধুকধুকি জাগায়, তবে বুঝিতে পারিবে—আমরা এখানে প্রতিদিন তোমার জন্য কি রকম কাঁদি।

স্নেহশীল দাদা! তুমি যবে আমাদের সঙ্গে ছিলে, তখন সকল ভাই বোন

যাহাতে ভাল থাকে, সুখে থাকে, ধর্ম্মে জ্ঞানে কর্ম্মে বড় হয়, সে বিষয়ে কি রকম যত্ন করিতে! সে সমস্ত কথা আজ মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়! আজ আমরা কেবল কুটিল-মলিন বিষয়ের চক্রে পড়িয়া ঘানির বলদের মত ঘুরিয়াই চলিতেছি! আমাদের প্রাণে আর সে হাসি নাই—সে প্রাণ নাই—আনন্দধ্বনি অন্তরে জাগিয়া উঠিতে না উঠিতেই অর্দ্ধপথে থামিয়া যাইতে চায়! তুমি সেই দেব-দেবের চরণে যে গান শুনাইতেছ—তাহার ছিটেফোঁটাও আমাদের প্রাণে ফেলিয়া আশীর্ব্বাদ কর—আমাদেরও প্রাণে তোমারই মত সেই প্রাণের দেব-তার গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক—আর

সেই আনন্দসঙ্গীত শুনিয়া দুঃখ শোক নিরানন্দ নিরাশা পরাহত হউক এবং সকলের হৃদয় আশার ও আনন্দের ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হউক।

সেঃ শ্রুঁঃ

২৯। এত কষ্ট কেন ?

বিশ্বজননী ! মা ! তোমার রাজ্যে এত কষ্ট কেন ?—কত লোকের পিতামাতা অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া সন্তানগণকে বিপদসাগরে ভাসাইয়া দেয় ; কত রমণীর জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণপ্রিয় পতি অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে চিরজীবন বৈধব্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইবার জন্য ইহলোকে

রাখিয়া যায় ; কত পিতামাতার বৃদ্ধবয়-সের একমাত্র যষ্টি, আদরের ধন পুত্র অকালে ভবযন্ত্রণার হাত এড়াইয়া তাহাদিগকে আমরণ শোকাগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য রাখিয়া যায় ! মা ! এত কষ্ট, এত দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া আর তো পারি না ! বলিয়া দাও মা ! তোমার রাজ্যে এত কষ্ট কেন ? কত বড় বড় অট্টালিকাতে আমোদপ্রমোদের হল্লা চলিতে থাকে—কত খাদ্যদ্রব্যের, কত পানীয়ের বৃথা ছড়াছড়ি হইতে থাকে ; শেষে কর্ম্মচারীরা সেই সমস্ত অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য আস্তাকুঁড়েতে ফেলিয়া দিয়া আসে ! আর—হয় তো সেই সময়েই এক অভাগিনী

দুঃখিনী আহারের অভাবে পাগলিনী হইয়া অতি ধীরে—ধীরে—অতি সন্তর্পণে—সেই আস্তাকুঁড়েতে পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্য একটী একটী করিয়া খুঁটিয়া খাইয়া নিজের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিতেছে ! উঃ—এ সমস্ত কথা ভাবিয়া আর যে পারি না—বুক যে ফাটিয়া বাহির হইতে চায় ! মা—এত দুঃখ কেন, এত রোগ-শোক কেন—এখানে মৃত্যুর এত প্রতাপ কেন ? মা—আমি তোমার রাজ্যের এই রহস্য সম্বন্ধে কোন্ বিচার করিতে চাহি না। আমি জানিয়াছি—তুমি আমার প্রত্যক্ষ পিতা—তুমি আমার প্রত্যক্ষ মাতা—আমি এ সমস্ত রহস্য বুঝিতে না পারিলেও এটুকু জানিয়াছি—বুঝিয়াছি

যে, তোমার রাজ্যে অন্যায় নাই—অমঙ্গল নাই। কিন্তু জননী—এই অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না—দুঃখকষ্টে আমার হৃদয়ে যে প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহা যেন আমি আশেপাশে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া দীনদুঃখীর দুঃখকষ্ট নিবারণ করিতে পারি। জননী! আমার যে সমস্ত ভাইবোনের দুঃখশোকে দুই চক্ষু বিষাদ-নীরে ভাসিয়া যায়—যাহাদের পাপতাপ অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, নয়নের জলে ধৌত হইয়া যায়—দাও পিতা—দাও জননী—আমার অন্তরে বল দাও—ইচ্ছা দাও—শক্তি দাও—যেন সেই সমস্ত অজানা অপরিচিত

ভাইবোনদিগকে আমার এই আকুল প্রাণের মধ্যে আশ্রয় দিয়া তাহাদের চক্ষের জল মুছাইতে পারি—তাহাদের দগ্ধপ্রাণে শান্তির ধারা বহাইয়া দিতে পারি। এইটুকু আশীর্ব্বাদ দাও—যদি কখনও কোন শ্রান্তক্লান্ত পথিক সংসার-অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রুধিরাক্ত দেহে আমার প্রাণের ভগ্ন-কুটীরে আসিয়া দাঁড়ায়—আমি যেন তোমার মধুময় নামের গুণে—তোমার প্রেমের মৃতসঞ্জীবনী শক্তিবলে তাহার সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করিয়া তাহাকে নবজীবন দান করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি। প্রেমের আঘাতে আমাকে পাগল করিয়া দাও। প্রেমেতে-প্রেমেতে—

তোমাতে-আমাতে একাকার করিয়া দাও; প্রেমের এক মহা জলস্তম্ভ রচিত হউক—জননী—দাও—দাও—আমাকে তাহার ভিতর তলাইয়া যাইতে।

ওঁ

৩০। আমার গান।

যাও—যাও— ওরে আমার গান—যাও। ঐ যে মহাশূন্যের পর মহাশূন্য—স্তরে স্তরে স্তরে আমার প্রাণের উপর চাহিয়া আছে—ওরে আমার গান—যাও চলে যাও—ঐ উন্মুক্ত মহাশূন্যের ভিতর দিয়া। ঐ যে মহাশূন্যের মহানীরবতা অচল অটল মূর্ত্তিতে ত্রিকালজ্ঞের ন্যায় স্থির হইয়া আছে—যাও—যাওরে আমার

গান—ঐ নিথর নীরবতাকে মুখরিত করিয়া —যাও—গানের প্রতিধ্বনি বিশ্বজননীর মহাবীণায় ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। যাও—যাও —ওরে আমার গান—আজ এই সন্ধ্যা-বেলায় মায়ের নামে বিশ্বজগতের এপার আর ওপারকে এক করিয়া চলিয়া যাও। হায়-হায়! এই মহানীরবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহারা কেমন করিয়া যে এই ধুলোকাদা লইয়া খেলা করে, এই বৃথা কোলাহল-কলরবে ডুবিয়া থাকে, কিছুই তো বুঝি না। ঐ মধুময় অনন্তের দিকে ইহাদের একটীবারও কি দৃষ্টি পড়ে না? কোন্ ঘুর্ণীপাকের টানে ইহারা কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়াছে—সেদিকে ইহাদের লক্ষ্যই নাই! ওরে আমার গান—যাও

—অনন্তের অরূপ রূপসাগরের ছবি দেখাইয়া এই সমস্ত পথহারা লোক-দিগকে পাগল করিয়া দাও—ওরে পাগল করিয়া দাও ! মায়ের নামের এমন মন্ত্র ইহাদের কানে শুনাইয়া দাও—যাহাতে ইহারা এই সমস্ত বাজে খেলা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠে। যাও—যাওরে আমার গান—কনকতপনের সঙ্গে গাহিয়া যাও। যখন ঝড় পশ্চিম কোণ হইতে হু-হু স্বরে চলিয়া আসিয়া সুগম্ভীর হুহুঙ্কার ছাড়িতে থাকিবে—সেই ঝড়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া আমার প্রাণ যেন গান গাহিতে থাকে। শরতের সুনিস্তব্ধ পৌর্ণমাসী রাত্রে সুনির্ম্মল গগনতলে চন্দ্রমা যখন টুকরা-

টুকরা মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতে থাকিবে; সুমন্দ দখিণে বাতাস যখন প্রাণের ভিতর গভীর ঔদাস্য আনিয়া দিবে, তখনও যেন আমার গান তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমার প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তোলে। যাও—ওরে আমার গান—মহাশূন্যকে মহাপূর্ণ করিয়া তোল; মরুভূমির ভিতর দিয়া গিয়া তাহাকে সরস করিয়া তোল—মরুভূমি শত মন্দাকিনীর উৎস হইয়া উঠুক। আমার গান স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালে ব্যাপ্ত হউক—ভুবনে-গগনে ছাইয়া যাউক—দীনদুঃখীর অশ্রু মুছাইয়া দিক—ওপারের বার্ত্তা বহন করিয়া পাপ-তাপে দগ্ধ প্রতিজনের হৃদয়ে শান্তি

আনয়ন করুক। এই গানে—এই প্রেমের বাঁধনে—বিশ্বে আর আমাতে এক হইয়া যাই—জগজ্জননী আমার হৃদয়ে আসন পাতিয়া অধিষ্ঠান করুন। আমার গান গাহিবার ব্রত উদ্‌যাপিত হউক।

৩১। ভগ্নীর স্মরণে।

আমি বা কোথায় ছিলাম—কোথা হইতেই বা আসিলাম; তুমিই বা কোথায় ছিলে—আর কোথা হইতেই বা আসিলে? তুমি কোন্—সুদূর—আকাশে—কোন্ সুদূর গ্রহে ছিলে, আমি কিছুই জানি না। এ জন্মের পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ছিল—কিছুই জানি না। কিন্তু এটুকু জানিয়াছি যে তুমি এ জন্মে আমার

কাছে স্নেহময়ী প্রেমময়ী ভগ্নীর মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলে—আমাকে নিষ্কাম প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য। আসিলে যদি—তবে চলিয়া গেলে কেন? অন্তরের নিভৃততম কোণে তোমাকে রাখিয়া, তোমাকে ভাল বাসিতে বাসিতে তিলে তিলে শুকাইয়া যাই—সে-ও আমার বড় ভাল লাগে। অন্তরের প্রেম ভক্তি দিয়া তোমাকে সকলের অজ্ঞাতে পূজা করিতে করিতে চলিয়া যাইতে চাই—তোমাকে যে কতটা ভালবাসি, তাহা প্রকাশ করিয়া জানাইতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়—শুকাইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া যাই—সেই আমার ভাল—এমন কত কত শতদল, কত গোলাপ তো হাসিগন্ধ

প্রাণের ভিতর পোষণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতে ঝরিয়া যায়। মনে পড়ে,—তোমার মুখে দুঃখের মলিন ছায়া পড়িলে প্রাণের ভিতর কি অস্থিরতা—কি অধৈর্য্য জাগিয়া উঠিত! মনে পড়ে—আমারও প্রাণে দুঃখকষ্টের কারণ উপস্থিত হইলে শান্তিলাভের আশায় তোমারই কাছে ছুটিয়া যাইতাম! এত ভালবাসা—এত ভালবাসা—পাছে কেহ জানিতে পারে, পাছে তাহা এতটুকু বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে—এই ভয়েই হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিত। তোমার কাছে গেলেই তো শান্তিলাভ করিতাম—দুঃখের কথা তো বলিবার অবসরই হইত না। এ কথা সে কথা—যাহা কিছু বলিত

মনে করিয়া যাইতাম, তোমার সেই স্বচ্ছ সরল মুখ দেখিয়া সে সমস্তই ভুলিয়া যাইতাম। তোমার সেই প্রেমপূর্ণ হাসি, তোমার সেই ধর্ম্মপূত হৃদয়ের পবিত্র আহ্বান—আমার সমস্ত দুঃখকষ্ট, সমস্ত কথাই যে ভুলাইয়া দিত! আমি তো তোমার ভাইয়ের উপযুক্ত কোন কাজই করিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি যে লোকেই থাক—একবার আসিয়া দেখ—তোমাকে আমি কত ভালবাসি! আজ সংসারে চারিদিক হইতে বিপদ-আপদ আমাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে চায়—আজ একবার তোমার সেই শান্তিপূর্ণ মুখখানি আমাকে দেখাও—আমাকে আশীর্ব্বাদ কর—আমার সমস্ত

বিপদ কাটিয়া যাউক। কবে আবার তোমার সঙ্গে মিলন হইবে—তাহারই প্রত্যাশায় দীর্ঘ—দীর্ঘ বৎসর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। আর পারি না—চরণতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে—একটীবার তোমার বুকে মাথা দিয়া সুদীর্ঘ নিদ্রায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে চাহি।

—ওঁ—

৩২। চিতার আগুন।

হৃদয় আমার শ্মশান হইয়া গিয়াছে—শ্মশান হইয়া গিয়াছে! সেখানে দিবা-রাত্রি কেবলই চিতার আগুন জ্বলি-তেছে! কত আশাভরসা লইয়া সংসারে নামিয়াছিলাম—সকল আশা-ভরসাই একে একে নিভিয়া গেল! কি লইয়া এখন যে জীবনপথে চলিব—কিছুই ভাবিয়া পাই না। জীবনে আর সে হাসি নাই,

হর্ষ নাই—আনন্দ নাই। সমস্ত জীবনের ভিতর দিয়া যেন নিরাশার নিরানন্দের একটা অদৃশ্য আগুন জ্বলিতেছে,—আর আশা আনন্দ যাহা কিছু সম্মুখে পাই-তেছে, তাহাকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এই যে নীরস মরুভূমি আমার আশে-পাশে চলিয়াছে—আমার হৃদয়ও এখন এই মরুভূমির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেশ এক হইয়া গিয়াছে! এই যে মহা-সাগর ভেদ করিয়া মহাক্রন্দনের রোল উঠিতেছে—আমারও হৃদয়ের ক্রন্দন উহারই সঙ্গে একতানে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! মা আমার! জননী, আমার! এই চিতার আগুনে যখন শয়ন করিয়াছি—এই সময়ে একবার

আমার সম্মুখে দাঁড়াও। আমার হৃদয় সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বে একবার তুমি কাছে আসিয়া দাঁড়াও। আর একবার সেই ছেলেবেলার মত তোমায় মা বলিয়া ডাকিতে দাও! একবার চাহিয়া দেখ—তোমার সন্তান আমি—আমার দেহখানা কিরকম সংসার-কণ্টকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। আজ আমি তোমার নিকট শত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। সন্তান হইয়া যখন জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি,—তখন তো তোমার নিকট সহস্র অপরাধ করিবার অধিকার লইয়াই আসিয়াছি; আর তখন তো ক্ষমাপ্রার্থী হইবারও অধিকার লইয়া জন্ম-

গ্রহণই করিয়াছি। মা—মা—একবার তুমি তোমার এই দুষ্ট সন্তানকে কোলে তুলে লইয়া আদর কর—একবার সেই পূর্ব্বের মত তোমায় প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে দাও। আর একবার তুমি তোমার স্নেহচুম্বনে আমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া দাও—সকল বিপদ আপদ কাটাইয়া দাও—সকল জ্বালা-যন্ত্রণার উপরে শান্তিবারি বর্ষণ কর।

৩৩। বিদায় গ্রহণ।

হে মহাসাগর! আর কেন?—তুমিও এবারে আমায় বিদায় দাও। তুমিও আর আমাকে ধরিয়া রাখিও না। বিদায়—বিদায়! আমার মত কত লোক আবার তোমার এই তীরে আসিয়া বসিবে—আমারই মত কত লোক তোমার ঐ অনন্ত ক্রোড়ে ঝাঁপ্ দিতে চাহিবে—কিন্তু আমি আর সে সমস্ত

দেখিতে পাইব কি না জানি না—আমি আজ তোমার নিকট বিদায় লইলাম। কত লোককে তোমার রুদ্রমূর্ত্তি কত বিভীষিকা দেখাইবে—আবার কত লোককে তুমি তোমার স্নেহের সুরে প্রেমের গানে ডাক দিবে—কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার আবার কবে দেখা হইবে জানি না—বিদায়—বিদায়! ঐ বটগাছে আবার না জানি ওপারের কোন্ দূত ওপার হইতে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিবে—না জানি কোন্ বিহঙ্গ আবার কবে প্রেমের গান গাহিয়া কোন্ প্রেমিকের অন্তরে ঝঙ্কার জাগাইয়া তুলিবে—আমি কিন্তু তখন কোথায়—? আমার সে সম্বাদ, সে গান শোনা হইবে কি না

জানি না—বিদায়—বিদায়! হে মহা-সাগর—আমাকে আজ—দাও—বিদায়—বিদায়!

বিদায় দিলেও তোমার সঙ্গে সম্প্রীতি কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। এই পুরাতন বন্ধুতা—এত ভালবাসা—ইহা কি কখনও ছিঁড়িতে পারে? তুমিও চলিয়াছ—কোন্—অজানা দেশেতে; আমিও চলিয়াছি ভাসিয়া—কোন্—পরিচিত-অপরিচিত—অনন্ত দেশে! আমি যে দেশে চলিয়াছি—সে দেশে নাহি দিন—নাহি রাত্রি—কেবলই অনন্ত আলোক—আর তাহারই তরঙ্গের ছন্দে ছন্দে তালে তালে গ্রহতারাগণ কি সুমধুর গান গায়! তোমারই তীরে আসিয়া আমি

সেই অনন্ত দেশের আভাস পাইয়াছি—তুমি আমার নমস্কার গ্রহণ কর। আবার যদি কখনও তোমার কাছে আসি—তোমারি হৃদয়ের কোণে একটুখানি স্থান দিও। আজ তবে—বিদায়—বিদায়! মহাসাগরের তরঙ্গ হইতেও প্রাণ-হরা প্রতিধ্বনি উঠিল—বিদায়—!

৩৪। অকূলের কূল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। সকলেই দেখিতেছে—খুঁজিতেছে—কোথায় তাহাদের জীবনতরীর নোঙ্গর ফেলিবে। সকলেই সন্ধান করিতেছে—কোন্ স্থানটী ভাল—কোথায় কাঁটার আঘাত পাইতে হইবে না—কোথায় অপর পাঁচজনের জীবনতরী নোঙ্গর ফেলিয়াছে। আমি কিন্তু কোন সঙ্গীও চাহি না—ভাল মন্দ

স্থানেরও বিচার করিতে চাহি না। আমি শুধু ভাসিয়া যাইতে চাই—শুধুই ভাসিতে চাই—ঐ—অনন্ত—অনন্ত— মহাসাগরে —উহাই তো আমার বিশ্রামের স্থান! না—না—হে উপকূলের আশ্রয়প্রার্থী—সাগরতীরের মোহমুগ্ধ—তোমাদের কেহ আমার সঙ্গে মহাসাগরে ভাসিবার চেষ্টা মনে স্থান দিও না। কোথায়—কখন্—একটুখানি মেঘ উঠিবে—আর মহাসাগরের ঢেউয়ের এক আছাড়ি-পাছাড়ি খেলা লাগাইয়া দিবে—তখন তোমাদের হায়-হায় করাই সার হইবে। তাহা অপেক্ষা তোমরা পূর্ব্ব হইতেই একটু ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তীরে নোঙ্গর ফেলিয়া দাও—অনেকটা নিরাপদ

হইবে। আর তোমরাও আমার জন্য কিছুমাত্র ভাবিও না—তোমরা ভাবিতেছ —তোমাদের এই নিরাপদ কূল ছাড়িয়া দিয়া না জানি আমি কোনও কূল পাইব কি না। ভয় নাই—ভয় নাই—তোমাদের চক্ষে কূল দেখা যাইতেছে না বটে ; —আমি কিন্তু ওপারের কূল স্পষ্টই দেখিতেছি। তোমরাও যখন আমার মত অকূলের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে—তখনই দেখিবে—অকূলেরও কূল আছে—সে কূলে তোমাদের এখানকার মত দিনরাত্রির ভাগ নাই—সন্ধ্যা নাই—আঁধার নাই। কাহারও বুকে যদি সে রকম্ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে হারাইবার সাহস থাকে—তবে চলিয়া এস—

আমার সঙ্গে অনন্তসাগরে ভাসিয়া পড়িবে—এস !

৩৫। শুকতারা।

এই মহাসাগরের তীরে বসিয়া বসিয়া কত কাল কাটিয়া গেল—আমাকে না বলিয়া-কহিয়াই মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! সেই সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া এখানে বসিয়াছিলাম—আর এখন দেখিতেছি—প্রভাতের দূত শুকতারা আসিয়া আকাশে দেখা দিয়াছে! চারি-দিকেই গভীর সুষুপ্তি—সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা!

কেবল আমারই হৃদয়ে আজ অনন্তের সং-স্পর্শে জাগরণ জাগিয়া উঠিয়াছে! এখন চাঁদ ডুবি-ডুবি করিতেছে—আলো-আঁধারের ভিতরে অন্ধকারই যেন ফুটিয়া উঠিতেছে! এই প্রভাতের মলয়হিল্লোলের সঙ্গে কোন্ সুদূর পল্লী হইতে কোন্ বিরহীর প্রাণের ব্যথা বাঁশীর তানে ভাসিয়া আসিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছে! হে বিরহী —এস—এস—আমার প্রাণের ভিতরে এস—তোমার জন্য এই হৃদয়ে অনেক স্থান আছে। তুমি তোমার ব্যথাকে বড় ব্যথা মনে করিয়াছ—আর আমার প্রাণের ভিতর একবার প্রবেশ করিয়া দেখ—দেখিবে—তোমারই বিরহব্যথায় আমার প্রাণে কিরকম ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছে!

তোমার ব্যথায়—ঐ দেখ—আমারই মত শুকতারারও নয়ন হইতে অবিশ্রামে অশ্রু-শিশির ঝরিতেছে। শুনিয়াছি—সম্পদ বিভক্ত হইতে হইতে যেমন ক্রমশই হ্রাস হইয়া যায়, সেইপ্রকার বিপদের ব্যথাও নাকি অংশীদার পাইলে কমিয়া যায়। এস তবে বিরহী—আমার প্রাণে এস—আমরা দুজনেই এস—এই বিরহ-পূর্ণ ধরণী ছাড়িয়া ঐ শুকতারার নিকটে উপস্থিত হই ;—সেখানে—ঐ গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে একবার ভাল করিয়া কাঁদিয়া লই—একবার আপনাকে ভুলিয়া—আত্মহারা হই—সমস্ত বিরহব্যথা বিদূরিত হউক।

৩৬। প্রণাম।

মা আমার! জননী আমার! আজ এই নবজীবনের প্রত্যুষে আমার হৃদয়কে তোমার অপরূপ অরূপ জ্যোতিতে পূর্ণ করিয়া একবার আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার পিতা—তুমি আমার মাতা—আমি তোমার দীনহীন মলিন সন্তান। এই মলিন সন্তানের উপর কত স্নেহ কত

আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়াছ—তাহা তো বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। এই মহাশূন্য—তোমার জগতে ইহা একটী বালুকারও বালুকা—এই মহাশূন্য তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন! এই মহাকাল—ইহা তো সমুদ্রের তরঙ্গের একটী বুদ্বুদমাত্র—এই মহাকালও তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন! কিন্তু আমার ন্যায় মলিন সন্তান—তোমাকে কি প্রকারে প্রাণের ভিতর ডাকিয়া আনিয়া বসাইব—কিছুই জানি না। আমার নিজের প্রাণের ব্যথায় আমি নিজেই অধীর হইয়া আছি। জননী! তোমা হইতে দূরে গিয়া খেলিতে খেলিতে কাঁটার বনে গিয়া পড়িয়াছিলাম। মা—একবার দেখ—

কাঁটার আঘাতে সর্ব্বাঙ্গে—কোথাও বাকী নাই—রক্তের স্রোত ছুটিয়াছে—তোমার স্নেহহস্তে সেগুলি মুছাইয়া দাও—আমি আর তোমাকে ডাকিব কি?—তুমি আপনি আসিয়া তাহা মুছাইয়া দাও। জননী! আমার সর্ব্ব অঙ্গে বড়ই ব্যথা—কথা কহিতেও বড় কষ্ট—কেবল তোমাকেই মা—মা—বলিয়া ডাকিতেছি—তোমার ঐ স্নেহপূর্ণ বক্ষে আমার মাথাটী রাখিতে দাও—আমার প্রাণ শীতল হউক। তোমার চরণে যতই কেন গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকি—তোমারই তো সন্তান আমি—তুমি তোমার সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা কর। জননী আমার! আর আমি তোমাকে ছাড়িয়া

এক পদও দূরে যাইব না। এই ব্রহ্ম-মুহুর্ত্তে তোমাকে প্রণাম করি—প্রণাম করিয়া এই ভিক্ষা চাই—আমার চিত্ত-কমলে তোমার নিত্যধাম সুপ্রতিষ্ঠিত কর—সেথানে তোমার প্রসন্ন মুখের হাসি নিত্যই ফুটিতে থাকুক—আমার চিত্তকমল চিরপ্রস্ফুটিত থাকিয়া তোমার নিত্য-আসনে পরিণত হউক। সকালে সন্ধ্যায় তোমাকে প্রণাম করিবার অধিকার দাও। জননী! তোমাকে প্রণাম করি—তোমাকে প্রণাম করি।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হিতৈষণা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অভিমত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; উৎকৃষ্ট ছাপা, সবুজ কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ।• আনা।

সনাতন-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় বলেন,—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি নামক গ্রন্থখানি আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম; ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বেদোক্ত একেশ্বরবাদই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি। আমার সুহৃদ্বর ক্ষিতি বাবু এই একেশ্বর-বাদ অতি সুন্দররূপে তাঁহার গ্রন্থে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে কলিকাতায় কি ভাবে অধার্ম্মিকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সময়ে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম হইতে হিন্দুসাধারণকে কি ভাবে সনাতনধর্ম্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই, তাহা গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে গ্রন্থমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে ধর্ম্মের সার তত্ত্বগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থকার শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে দিয়াছেন। প্রত্যেক বালক-বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া

শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, এই গ্রন্থই পথভ্রান্ত পথিকের দিক্ নির্ণয় করিয়া দিবে। এই গ্রন্থের কোন কোন স্থলে ক্ষিতিবাবুর সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও মূল লক্ষ্য বিষয়ে মতভেদ নাই। আমার মনে হয়, সাধনবিষয়ে যিনি যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, এক লক্ষ্যেই আসিয়া পৌঁছিতে হইবে; অবশ্য সেইটী বেদোক্ত পন্থার মধ্যে অন্যতম হওয়া চাই। ক্ষিতিবাবু সেই বৈদিক পন্থা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আবশ্যকতা যে ভাবে দেখাইয়াছেন, এভাবে ইতিপূর্ব্বে কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। আমার অনুরোধ, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। সঞ্জীবনী—৩১শে বৈশাখ, ১৩৩২।

চিন্তাশীল লেখক বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্ষিতীন্দ্রবাবু সুপরিচিত। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার "আর্ট ও সাহিত্য" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি ও তাহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব আকস্মিক ব্যাপার নহে; ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবসংঘর্ষের স্বাভাবিক পরিণতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষিতীন্দ্রবাবু সহজ ভাষায়, সরল ও প্রাঞ্জলভাবে এই গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক কূটতর্ক নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, অথচ তাহার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে এই

গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এই শক্তির মূল উৎস কোথায়, তাহা জানিতে হইলে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। অনেক ব্রাহ্ম লেখকের রচনার মধ্যে আমরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি একটা কুসংস্কারপূর্ণ অবজ্ঞার ভাব দেখিতে পাই; ক্ষিতীন্দ্র বাবু যথাসম্ভব সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার-মুক্ত উদার মনোভাব লইয়াই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীমতী কামিনী রায় এই গ্রন্থের একটী সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আয়তন হিসাবে গ্রন্থখানির মূল্য অতি সুলভ।

আনন্দবাজার পত্রিকা—৮ই শ্রাবণ, ১৩৩১।

We welcome the book as a laudable attempt at removing a real need. Both the matter and the manner of the book will be found interesting by those for whom it is intended.

The Indian Messenger—15th February 1925

প্রভাতী—রয়াল ১৬ পেজী আকারের ১২৬+৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; স্বর্ণমণ্ডিত সুন্দর সবুজ কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৬০ আনা—ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ইহা একখানি গদ্য-পদ্যের গীতিকাব্য। এই বর্ণনা ঠিকই হইয়াছে। ভাষাতে

গদ্য হইলেও ভাবে ইহা পদ্যময় গীতিকাব্যই বটে। প্রভাতে কর্ম্মের আহ্বানসূচক যে সকল চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়াছে তাহাই আবেগময়ী ভাষাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আশা করি, ইহা অনেক প্রাণ নবীন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করিবে। ভুলক্রমে, একটি লেখাই দুই নামে দুই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানা দেশবাসী যুবক-যুবতীদের হাতে দেখিতে ইচ্ছা করি। তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ই চৈত্র, ১৮৪৬ শক।

এই পুস্তকে "প্রভাতের আহ্বান" প্রভৃতি ছত্রিশটী সন্দর্ভের দ্বারা ভগবানে আন্তরিক অনুরাগ অর্পিত হইয়াছে। চিরপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মকথাগুলিকে গ্রন্থকার তাঁহার সরল সুন্দর ভাষায় সুনিপুণ কৌশলের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হৃদয়ে একটা ধর্ম্মভাব স্বতই জাগিয়া উঠে।

কায়স্থ-সমাজ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩১ সাল।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধীয় নানা কথা যাহা লেখকের জীবনপ্রভাতের সহিত জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাই অতি উপাদেয় রূপে গদ্যপদ্যে লিখিত হইয়াছে। উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৩১ সাল।

ভগবচ্চরণে প্রার্থনার সমষ্টি। ভাষায়, ভাবে অতি সুন্দর। লেখকের জীবনের অনুভূতি ও প্রাণের কথা ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে। ভক্ত ও ভাবুকজনের উপভোগ্য।

আনন্দবাজার-পত্রিকা ৩১শে ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ সুলেখক, চিন্তাশীল, ভাবুক, কবি। তাঁহার প্রভাতী সুপ্তিমগ্ন দেশবাসীর পক্ষে জাগরণের সোনার কাঠি। প্রভাতী পড়িয়া আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। পুস্তকের ভাষা সুন্দর। বাঁধাইও বেশ সুন্দর। স্বরাজ, ৮ই চৈত্র, ১৩৩১ সাল।

ইহাতে 'প্রভাতের আহ্বান' 'প্রেমমুখ' 'বিশ্বজয়ের প্রার্থনা' 'দয়াল নাম' এবং 'অমৃতের অধিকারী' প্রভৃতি ছত্রিশটী সন্দর্ভ বিন্যস্ত হইয়াছে। অধিকাংশ সন্দর্ভই গ্রন্থকারের আন্তরিক এবং অকপট ভগবদনুরাগের পরিচায়ক—সদ্ভাব-পরিমলে ভক্ত-ভাবুকের মনোমদ। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই উত্তম। গ্রন্থপ্রারম্ভে গ্রন্থকারের চিত্র সন্নিবিষ্ট। বঙ্গবাসী, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ। দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ৵০ আনা। রয়াল ১৬ পেজী ১০৬+২২+১।০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ডাঃ মাঃ ।০ চারি আনা।

ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিমাত্রই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। অতি সরলভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আলোচনা অনেক স্থলে সংক্ষিপ্ত হইলেও আন্তরিকতাগুণে হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থীদের সকলকেই আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তত্ত্ব-কৌমুদী—১৬ই চৈত্র, ১৮৪৬ শক।

গ্রন্থখানিকে যে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিতে হইয়াছে, তাহাতেই ইহার গুণ ও জনসমাজের নিকট আদরের আভাস প্রকটিত হইতেছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় যে বলিয়াছেন—'জগতে এক মহান্ উন্নতির স্রোত' অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিতেছে। ......কত জাতি উন্নতির পথে উঠিতেছে। কোন জাতি নিজেদের দোষে অবনত হইয়া পড়িল। তাই বলিয়া উন্নতির স্রোত বন্ধ হইতে পারে না। সেই জাতির ভগ্নাবশেষ লইয়া আর দশ জাতিকে আরও অধিকতর উন্নতিতে আরোহণ

স্ফুরিতে দেখা যায়।' জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই কথাটীকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জগতের সৃষ্টির সময় হইতেই যে এই উন্নতির স্রোত বহিয়া আসিতেছে তাহা তাঁহার গ্রন্থ পড়িলে বেশ ভালরূপেই বুঝা যায়। গ্রন্থমধ্যে বহুস্থলে বহু উন্নতভাবের সমাবেশ রহিয়াছে।

কায়স্থ-সমাজ—ফাল্গুন চৈত্র, ১৩৩১ সাল।

মহর্ষি বলিতেন ইহা তাঁহার "পথের কথা"। ব্রহ্মলোক-যাত্রীর ইহা অমৃত উপদেশ। উদ্বোধন—চৈত্র, ১৩৩১ সাল।

বহুদিন পর মহর্ষির উপদেশমালার নূতন সংস্করণ ক্ষিতীন্দ্র বাবু প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষির উপদেশের পরিচয় দিতে চেষ্টা করা অনাবশ্যক। মহর্ষির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থের সমাদর করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা—৩১শে ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল।

মহর্ষির উপদেশ, তাহা যে অমৃততুল্য, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। মর্ত্তের মানুষ এই উপদেশের মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাইবেন। ধর্ম্মগ্রন্থের মতই ইহা নিত্যপাঠ্য। প্রতি ঘরে এই পুস্তকখানা সংগ্রহ করিয়া রাখা গৃহীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। পুস্তকের বাঁধাই সুন্দর। স্বরাজ—৮ই চৈত্র, ১৩৩১ সাল।

৩১ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে। এবার মহর্ষির ৮০ বৎসর বয়সের একখানি সুন্দর ছবি গ্রন্থখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। বিস্তৃত সূচী গ্রন্থের আর এক নূতন বস্তু।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতিই যে ঈশ্বরের ইচ্ছা, আর্য্য জাতির

ইতিহাস দ্বারা মহর্ষি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বর যে মঙ্গলময়, অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না; তাঁহারা যদি মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তবে আর ঐরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না।

এই গ্রন্থের প্রথম উপদেশে সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টিকৌশল, ঈশ্বরের পালন-শক্তি, তাঁহার করুণা ও রুদ্রভাবের বর্ণনা আছে।

দ্বিতীয় উপদেশে পৃথিবীর সৃষ্টি, জীবের আবির্ভাব, মানুষ ও তাহার সহায়।

তৃতীয় উপদেশে জড়-জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তির প্রকাশ।

চতুর্থ উপদেশে প্রাণীজগতে মহাপ্রাণের জ্ঞান ও ইচ্ছার পরিচয়।

পঞ্চম উপদেশে মনোরাজ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা ও জ্ঞানের চিহ্ন।

ষষ্ঠ উপদেশে মানবদেহে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা।

সপ্তম উপদেশে আর্য্যজাতির ইতিহাসে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও জ্ঞানের পরিচয়।

অষ্টম অধ্যায়ে মানবের স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন ইচ্ছা মানবকে মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া যে আনন্দিত করে, তাহার বিবরণ।

নবম উপদেশে আর্য্যদের উত্থান ও পতনের কারণ ও ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রকাশ।

দশম উপদেশে অধর্ম্মের আবির্ভাবে রুদ্রমূর্ত্তি প্রকট হন ও

অধর্ম্ম বিনাশ করিয়া যে নূতন সমাজ গঠন করেন, তাহার ইতিহাস।

একাদশ উপদেশে ঈশ্বরকে জানিবার ইচ্ছা ও এই ইচ্ছা হইতেই সর্ব্বপ্রকার উন্নতি।

দ্বাদশ অধ্যায়ে মানবের ঈশ্বরলাভের চেষ্টা।

ত্রয়োদশ উপদেশে আর্য্যগণের বহু দেবোপাসনার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোপাসনার ইতিহাস।

চতুর্দ্দশ উপদেশে আত্মোন্নতির উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। উহা পাঠ করিলেই ইহা সহজে বুঝা যাইবে যে গ্রন্থখানি কেমন শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

এই পুস্তক সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

সঞ্জীবনী—১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল।

প্রভাতী—রয়াল ১৬ পেজী আকারের ১২৬+৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; স্বর্ণমণ্ডিত সুন্দর সবুজ কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৸০ আনা—ডাকমাশুল ।০ আনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী অক্লান্ত। ইহাঁর পবিত্র লেখনী হইতে যে সকল সৎ-সাহিত্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অনেকের সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার রচিত "হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী"র অন্যতম। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"ইহা একখানি গদ্য-পদ্যের গীতিকাব্য।" কেহ মনে করিবেন না যে ইহাতে পদ্য রচনা আছে; গ্রন্থখানি আগাগোড়া কবিত্বময়

গদ্যে রচিত। ইহাতে যে গীতি আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তের নির্ম্মল আত্মা হইতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থখানি পবিত্র ভাবে ও পবিত্র চিন্তায় ভরপূর। পড়িতে পড়িতে মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়, হৃদয় নির্ম্মল হয়, এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। আজিকালিকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ পবিত্র গ্রন্থ অতিশয় বিরল। বাঙ্গালীর নিকটে এরূপ গ্রন্থের সমাদর হইলে বুঝিব, বাঙ্গালী সত্যসত্যই উন্নত জীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। বাঙ্গালীর কি সে শুভদিন আসিয়াছে? পুস্তকের ভাষা কিরূপ সরল ও সুন্দর, তাহার একটু নমুনা আমরা যদৃচ্ছাক্রমে একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"স্বাধীন পুরুষের সন্তান তুমি! স্বাধীনতাই তোমার জন্মগত অধিকার। রিপুগণ তোমাকে দিবানিশি তাহাদের জালে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। সাবধান—স্বাধীনতা কিছুতেই হারাইও না। এক মুহূর্ত্তের স্বাধীনতা—অনন্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করে। স্বাধীনতার শিঙ্গা বাজাইয়া দাও—স্বাধীনতার সহচর—প্রেম, ভক্তি দয়া প্রভৃতি—সকলে চলিয়া আসুক। রিপুগণের সঙ্গে লাগাইয়া দাও মহাসংগ্রাম। ইন্দ্রিয়-অশ্বের উপর চড়িয়া পড়—সংযমের লাগামে তাহাকে নিজের আয়ত্ত করিয়া যাও—ঐ সেনাপতি স্বাধীন পুরুষের নিকট হইতে আদেশ লইয়া এস, কি করিতে হইবে।' হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত হইতে দিও না—নিজের গৃহে শত্রুগণকে প্রবেশ করিতে দিও না। নিদ্রিত থাকিয়া শত্রুগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিও না—জাগিয়া উঠ। বিবেক-বিচারের শাণিত তরবারি ধারণ কর—আর ভগবানের নামে জয়ধ্বনি করিয়া বিপক্ষ রিপুগণের মধ্যে মৃত্যুর

আগুন ছড়াইয়া দাও।" ইত্যাদি। এইরূপ সুন্দর সরল ভাষা নির্ম্মল তটিনীর উল্লাসময় স্রোতের ন্যায় সর্ব্বত্র নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। পুস্তকের মুদ্রণ যেরূপ সুন্দর, বাঁধাইও তদ্রূপ। এই ক্ষুদ্র পবিত্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি; পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

গন্ধবণিক—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২।

Prabhati—by Pandit Kshitindranath Tagore. A real lyric in prose—the rhythmical flow of the soul in perfect tune with the Infinite Spirit, which has its dwelling in the dawn, in the clouds and flowers, rivers and mountains, and also in the rolling surging sea of life,—the Spirit waking the heart with a fresh call,—call to self-sacrifice, self-dedication, and self-forgetting life of duty and struggle,—the Spirit shining in all its resplendent beauty, infusing new life and new strength, dispelling all darkness and baptising all into a new life in it and a new vision of the lands of birth, of humanity and of life immortal in its eternal flow. The soul touched by the Spirit comes out in all its freshness—as fresh as the new-born dawn, and fresh flowers bathed in dewdrops and the new light of heaven. The reflections of the new

dawn have all the freshness and the beauty and perfection of fresh flowers,—which are the things of beauty and a joy for ever. May our revered brother live long to lift up our literature from its low level to a noble height with light and air, pure and fresh—fresh as the breath of life—life in the Sprit. Sj Benimadhav Dass

The World and The New Dispensation

February 26—1925.

Jnan O Dharmer Unnati,—the advance in knowledge and spiritual life.—The last message of Maharshi Devendranath Tagore,—A collection of his teachings dictated to Pandit Kshitindranath Tagore.—Our revered elder, Pandit Kshitindranath Tagore has laid the public, especially the people of the Brahmo Somaj under deep obligation for this publication. It is really the new Brahmic Upanishad,—the Upanishad of the age—embodying within a small compass a new interpretation of the scientific studies of the age and the doctrine of evolution and also the ancient Upanishadic teachings to bring out their deep spiritual significance and to establish that one purpose un-

folds itself through all movements of history and processes of creation, viz, the perfection of the plan of God in humanity as it rises step by step through its fall and rise, death and resurrection to the height of perfect knowledge and perfect religion in the life of unity with the Supreme Spirit. This is the book which, for its comprehensive thought embracing all the stages of creation and phases of life and rich diction, living simple flow of style, should find its place in every family for the use of the young and the old, alike. Sj Benimadav Dass

The World And The New Dispensation.

February—1925.

গ্রন্থকারের পূজ্যপাদ পিতামহ মহর্ষি তাঁহাকে কথাচ্ছলে যে সমুদায় উপদেশ দিয়াছিলেন, সেগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ৩১ বৎসর পূর্ব্বে "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" নাম দিয়া তৎসমুদায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"এখন যেমন আমরা নানা-জাতিকে উন্নতিশিখরে আরূঢ় দেখিতে পাই, পুরাকালেও সেইরূপ অনেক জাতি অনেক উন্নত হইয়াছিল ; যথা ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসীক, ইহুদী প্রভৃতি। তন্মধ্যে ভারতীয় আর্য্যগণ সভ্যতায় 'ভদ্রতায় উচ্চতম স্থান' অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে

হইয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থে সবিশেষ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।”
গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যাঁহারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশবাণী পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া গৃহে রাখিতে ও পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানির মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর। বাজে নভেল ও নাটক না পড়িয়া এইরূপ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিলে হৃদয় পবিত্র হইবে এবং জ্ঞানের সীমাও বাড়িয়া যাইবে। ৩১ বৎসর পরে এই পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত করিয়া ক্ষিতীন্দ্র বাবু বাঙ্গালাসাহিত্যের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।

গন্ধবণিক—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; উৎকৃষ্ট ছাপা, সবুজ কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

“ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি” পঞ্চদশ কথায় ১৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটী কথা এমন সরল সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে ইচ্ছা হয় ইহা প্রতিদিন পাঠ করি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সুপরিচিত লেখক, তাঁহার ভাষা যে সুন্দর তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। তিনি এই গ্রন্থে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিতে পারিলে কখনই এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিতে পারিতেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থখানি ধর্ম্মপ্রাণা, বিদুষী, আলো ও ছায়া প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় মহোদয়ার ভূমিকায় আরও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও ব্রাহ্মসমাজস্থ অনেক লোক তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি ও সরলতা থাকা সত্ত্বেও কেবল ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অযথা নিন্দিত হইয়াছেন। সাধু যাঁহাদের সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়। আজ সেই ব্রাহ্ম-সমাজের মত প্রাচীন সমাজে অবাধে চলিতেছে। সেইজন্য সাহস করিয়া বলিতে পারি, ক্ষিতীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থ প্রাচীন সমাজেও আদরণীয় হইবে। আমার মনে হয় এই রকমের একখানা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া সঙ্গত। সাম্প্রদায়িকতাদোষে এই গ্রন্থখানা দূষিত হইলেও মূল ধর্ম্মতত্ত্ব সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

কলেজের ছেলেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক শান্তি পাইবেন। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা না থাকায় পাঠ্যাবস্থায় অনেক ছাত্রকে কুপথে পতিত হইতে দেখা যায়। এই সরল সহজ গ্রন্থখানা পাঠ করিলে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র কি তাহা উত্তমরূপে বুঝা যায়। ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সেই ভাবে না চলিয়া থাকা যায় না।

গ্রন্থের দশম কথা, "মামেকং শরণং ব্রজ" ৯১ পৃষ্ঠা হইতে ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এই কথা প্রতিদিন পাঠ করিলে সাংসারিক দুঃখ হইতে শান্তি পাওয়া যায়।

আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জাতীয় গ্রন্থ আরও লিখিয়া মানবজাতির কল্যাণ করিবেন।

প্রতিভা—মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩১।

একখানি কবিতার বই, সরল স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষায় লিখিত। পড়িতে আনন্দ হয়। কতকগুলি কবিতা গানের মতই মধুর। আলোচনা—চৈত্র, ১৩৩০ সাল।

এই কবিতা-পুস্তকখানিতে অনেকগুলি কবিতা আছে; অধিকাংশ কবিতাই আমাদের নিকট প্রীতিপ্রদ বোধ হইল। ভাবগুলি যেন সাধকের প্রাণের ভিতর হইতে আসিয়াছে। শান্তিতে শান্তির উপকরণ আছে। সৌরভ—শ্রাবণ, ১৩৩১।

গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন "সংসারের দুঃখ-শোকে কণ্টকের আঘাতে অন্তস্তল যখন ক্ষতবিক্ষত হইবার উপক্রম হইত, অশান্তি যখন মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিবার উপক্রম করিত তখন এই সকল কবিতা লিখিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি।" বাস্তবই অনেকগুলি কবিতা সরল প্রাণের আকুল নিবেদন প্রকাশ করিতেছে। ইহা হৃদয়ের মহৎ ভাবকে জাগ্রত করিতে বিশেষ সাহায্য করিবে। এরূপ সরল কথায় সরল প্রাণের ভাব আজকাল অল্প কবিতাতেই ব্যক্ত হয়। আমরা আশা করি ইহা পাঠে অনেকেই উপকৃত বোধ করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদী-- ১৬ই পৌষ, ১৮৪৫ শক।

ইহা একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশ গানই ভগবানের উদ্দেশ্যে লিখিত, পবিত্র ও উন্নত ভাবপূর্ণ। ক্ষিতীন্দ্র বাবু সাহিত্যজগতে সুপরিচিত, তাঁহার রচনার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। আমরা তাঁহার এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

ঢাকাপ্রকাশ—৫ই আশ্বিন ১৩৩১।

SANTI—This is a small book containing

51 poetical pieces, of which many are songs. All the pieces are pervaded by a sincere spiritual feeling. Indeed most of them are hymns in praise of some aspect of the goodness of God. The language is highly poetic and befitting the theme of the respective pieces. We hope this book of Bengali verse will be in the hands of every lover of poetry.

The Devalaya Review—May 1924.

আর্ট ও সাহিত্য —ভাল কাগজে ও কাপড়ে বাঁধা, সর্ব্বশুদ্ধ ২১৫ পৃষ্ঠা—রয়াল ১৬ পেজী। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারবিরচিত হিতৈষণাগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ২২ সংখ্যক পুস্তক। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে আর্টের দোহাই দিয়া যে সমস্ত কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস কেবল আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই গ্রন্থখানির মুখ্য উদ্দেশ্য। নিবেদনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "একালের অধিকাংশ উপন্যাসলেখক উপন্যাস লিখিবার যে ধারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে আমাদের দেশের আমাদের জাতির সর্ব্বনাশ ও ধ্বংস নিশ্চিত ; এই ধারণা বশতঃ অনেক সময়ে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে বলিয়াই আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। * * * উপন্যাস-লেখকগণ কাহারও দোহাই দিয়া অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ উপন্যাস প্রকাশ করিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গে যেন আর বিষক্ষত উৎপাদন না করেন। তাঁহাদের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই

ভিক্ষা চাহি যে, দেশের ছেলেমেয়েদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াইয়া দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইবার একটুখানি অবসর দিন।"

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের অভিনব সংস্করণ সম্পাদক রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয় গ্রন্থখানির একটী সুখপাঠ্য ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা, পরবর্ত্তী যুগে গদ্যসাহিত্যের উৎপত্তি, আধুনিক ঔপন্যাসিক সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব প্রভৃতি সংক্ষেপে অথচ নিপুণতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। নিরাবিল ও পবিত্র দাম্পত্য প্রেম প্রসঙ্গে ভূমিকাকার যে মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং হৃদয়গ্রাহী—"স্নেহ বল, ভক্তি বল, প্রীতি বল, মৈত্রী বল, সহৃদয়তা বল, সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলই ঐ (সতীত্ব-ধর্ম্ম বা দাম্পত্য-প্রেম)" এ উক্তি কে অস্বীকার করিবেন? গ্রন্থকারের শুভ প্রচেষ্টায় প্রথম পুষ্প অর্ঘ্য দান করিয়া লেখক তাঁহার অমূল্য ভূমিকার সমাপ্তি করিয়াছেন।

আর্টের কথা একবিংশতি পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের চিরবরেণ্য তত্ত্বদর্শী মহাপ্রাণ আর্য্যঋষিগণের সহজ জ্ঞানে বিভাবিত অনাদিনিদান ভগবানের জাগ্রত স্বপ্রকাশ সত্তা নিখিল বিশ্বে উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থকার আর্টকে সত্য, শিব ও সৌন্দর্য্যের পরিকল্পনায় তুলনা ও বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানই আর্টের কেন্দ্র এবং সত্য শিব ও সুন্দরত্ব ব্যতীত প্রকৃত আর্টের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই তুলনামূলক বর্ণনা আধ্যাত্মিক ভাববহুল ও বড়ই মনোজ্ঞ। তৎপরে আর্টের দোহাই দিয়া সাহিত্যে যে দুর্নীতি ও বিপ্লব প্রবেশ

লাভ করিয়া ধর্ম্মপ্রবণ হিন্দুসমাজের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া উহাকে ধ্বংস ও অবনতির পথে দ্রুত টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা গ্রন্থকার কয়েকটী পরিচ্ছেদে বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। সেকালের উপন্যাসে আর্টের প্রভাব ও অভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর এবং রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি পুস্তকগুলির নিখুঁত নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা দেখিতে পাই। এই সমালোচনা সহজ সরল ভাষায় বিবৃত হওয়ায় গ্রন্থখানি নিতরাং প্রীতিপদ হইয়াছে; অপিচ উক্ত উপন্যাস-গুলির অনেক অপরিজ্ঞাত তথ্যের বিশ্লেষণে প্রাণে নবভাবের বিকাশ হয়। একালের উপন্যাসে যে সমস্ত দোষ বর্ত্তমান এবং যাহার প্রভাবে আমাদের বর্ত্তমান মানসিক অবনতি সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে, গ্রন্থকার তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। উপসংহারে উপন্যাসলেখকদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া বলা হইয়াছে "তাঁহারা যেন অশ্লীল ও অস্বাভাবিকভাবে মাখা উপন্যাস প্রকাশ করিয়া সুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের মনকে বিপথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা না করেন।"

আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি-লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের অন্তর্নিহিত দেশাত্মবোধ ও দেশহিতৈষণা গ্রন্থের আর একটী বৈশিষ্ট্য, তজ্জন্য তিনি দেশবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। দেশের ভবিষ্যৎ লেখকগণ আর্ট ও সাহিত্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখনী সঞ্চালন করিলে দেশের পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিবে। বঙ্গভাষার

উন্নতিকল্পে আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

সুবর্ণবণিক সমাচার—আষাঢ় ১৩৩০।

কিছুদিন হইতে সাহিত্য ও শিল্পে দুর্নীতির প্রশ্রয় লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে। দুর্নীতির প্রভাবের বিরুদ্ধে যে দুইখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর পুস্তকখানি অন্যতর।

শিল্প বা সাহিত্যে মানুষের সমাজ সংসার ও জাতীয় জীবন সমস্তটাই প্রতিফলিত হইয়া থাকে, উহার কোন অঙ্গ বা অংশ বাদ পড়িবার কথা নহে। শিল্প ও সাহিত্য, নীতির ভ্রূভঙ্গি বা শাসন মানিয়া চলিতে পারে না—পদে পদে তাহা মানিতে হইলে উহা সুন্দর ও সরস হইবে না; কিন্তু উহারা শৃঙ্খল নাই মানুক—শৃঙ্খলা ত মানিবেই—কারণ শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণই হইতেছে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা মানিতে হইবেই,—উহাদিগকে সংযমের দ্বারা মাঝে মাঝে বল্গিত করিতে হইবে এবং উহারা কোনদিকেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আজ আমাদের বাংলার সাহিত্য ও শিল্প সুরুচির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে ও কোন শৃঙ্খলা মানিতেছে না বলিয়াই এই দ্বন্দ্ব।

যে সাহিত্য বা শিল্প সত্য সত্যই প্রাণবান বা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে অনেক অমেধ্য জিনিষও সহনীয়—কারণ জীবনের একটা ক্ষমতা আছে যাহা অনেক অবিশুদ্ধ বা অপবিত্রকে সংস্কার করিয়া লইতে পারে—অনেক ক্লেদ-মলিনতাকে জীর্ণ করিয়া রসরক্তে পরিণত করিতে পারে—অনেক

গলিত ক্ষতকে অনাময় করিয়া তুলিতে পারে—অনেক অপাঙ্‌ক্তেয়কে পংক্তিভুক্ত করিতে পারে।

কিন্তু যে সৃষ্টি জড় ও অচল ও হীনায়ুষ্ক তাহার মধ্যে যাহা কিছু অমেধ্য পঙ্কিল বা ক্লিন্ন তাহা তদবস্থই থাকিয়া যায়।

শোণিতেরই হোক বা সলিলেরই হোক, প্রবাহ চাই। স্রোতস্বিনী নদীতে কত জঘন্য গলিত ঘৃণিত জিনিষ আসিয়া মিশে কিন্তু প্রবাহের গুণে তাহা বিদূরিত হইয়া যায় এবং সলিলকেও দূষিত করিতে পারে না—কিন্তু স্রোতহীন রুদ্ধ পল্বলে ঐ সকল অমেধ্য দ্রব্যের সংযোগে—একটা নরক হইয়া উঠে। সলিলের প্রবাহ সম্বন্ধে যে কথা খাটে—রসের প্রবাহ সম্বন্ধেও সেই কথা।

অপেক্ষাকৃত অমেধ্য ও রুচিবিরুদ্ধ অংশ বাদ দিলে যদি কোন সাহিত্য বা শিল্পের জীবনের হানি হয় তবে আমরা বলি ও অপবিত্রতা থাকুক—রুচি হতে জীবন অনেক বড়। কিন্তু যদি কোন সাহিত্যে অমেধ্যতা ও নীতি-বিরুদ্ধতা জীবনের সাহায্য না করিয়া শুধু অযথা লালসা ও অসংযমেরই উদ্দীপনা করে—তবে সে সাহিত্য বা শিল্প চণ্ডালের সম্মার্জ্জনীতে বহিষ্কৃত হোক্।

ভ্রমর মধু আহরণ করে—সে মধুর লোভে ভুল করিয়া বিষফুলেও বসিয়া থাকে—মোমের ফুলেও প্রলুব্ধ হয়। মধুর সন্ধান তাহার ভ্রান্তি ও প্রলুব্ধতাকে মার্জ্জনীয় করিয়া তুলে। কিন্তু যে মক্ষিকার অমেধ্য ও ক্লিন্ন জিনিসেই রতি—তাহাকে কে ক্ষমা করিবে? একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিতে কোন কোন অংশ থাকিতে পারে যাহা বিদগ্ধজনের পক্ষে রোচনীয় নহে—কিন্তু

উহা বর্জ্জন করিলে শিল্পকে ক্লীব ও পঙ্গু করা হয়—কিন্তু ঐ শ্রেষ্ঠ শিল্পী শুধু ঐ রুচিবিরুদ্ধ অংশের জন্যই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন নাই। অক্ষম অনুকারকগণ ঠিক করিয়া লয়েন—ঐখানেই স্রষ্টার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা এবং উহাকেই আদর্শ ধরিয়া, জঘন্য অংশটিকে বিপুলায়তন করিয়া রচনা করেন এবং ভাবেন পূর্ণকে আয়ত্ত করিয়াছি। একটা কাটা হাতকে অনুবীক্ষণের সাহায্যে বৃহৎ দেখাইতে পারে—কিন্তু তাহার তুলনায় একটি ক্ষুদ্র কীট অধিকতর পূর্ণ ও প্রাণবান।

এখনকার সাহিত্যে ও শিল্পে এই দোষটিই অনেকের সৃষ্টিতেই দেখা' যাইতেছে। উপন্যাস রচনা করিতে হইলেই—বেশ্যালয় ও শৌণ্ডিকালয় চাই; কুলত্যাগ, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, অশিষ্টালাপ ও লালসার মাদকতা ইত্যাদির সমাবেশ হওয়া চাই। যেন পবিত্র মানব-সংসারে—মধুর সামাজিক জীবনে—দুঃখ-দৈন্য-লাঞ্ছিত জাতীয় জীবনে আর কোন সাহিত্যের উপাদানই নাই; জীবনে আর কোন বৈচিত্র্য নাই—সংসারে আর কোন সমস্যা নাই—সমাজে আর কোন অভাব-অভিযোগ নাই। সুরা ছাড়া যেন অন্য পেয় নাই—গণিকা ছাড়া যেন অন্য নারী নাই—তাহার ব্যথা ছাড়া যেন অন্য ব্যথা নাই—উহাদের প্রসঙ্গ ছাড়া যেন আর প্রসঙ্গ নাই। শুধু তাই হইলেও চলিত—উপন্যাসকার রীতিমত যুক্তিতর্ক সাহায্যে পাপের জন্য ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন,—অসংযমের প্রতি তাঁহাদের চূড়ান্ত সহানুভূতি। উদারতা ও সহৃদয়তাকে সকলেই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিবে—কিন্তু উদারতার অজুহাতে বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দেওয়া সঙ্গত নয়। অনুতপ্ত ও লাঞ্ছিত

পাপের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিক, কিন্তু আজন্মশুদ্ধ তপোমেধ্য পুণ্যের উপরে বা পংক্তিতে তাহাকে স্থান দেওয়া যায় না—চৈতন্যলাভ করিয়াছে বলিয়াই কুলত্যাগিনী গণিকাকে সাধ্বী-সতী সংযমচারিণী কুলমহিলার সিংহাসনের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যায় না। এই দরিদ্র দৈন্যপিষ্ট দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে ঔষধাভাবে আশ্রয়াভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে—আরো লক্ষ প্রকার দুঃখ-বেদনা সতত দেশকে পীড়িত করিতেছে। তাহাতে সাহিত্যিকের হৃদয় বিগলিত হয় না; কাহার ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা হইল না, তাহার জন্য অশ্রুবর্ষণের বিরাম নাই। ঘৃণিতরুচি শ্রোতা ও দর্শক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নাট্যকার ও নটগণ কিরূপ অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই। চিত্রজগতেও তাই। সদ্যস্নাতা, স্নানরতা, প্রসাধনরতা ইত্যাদি চিত্রের সংখ্যাই বাড়িতেছে। পূর্ণনগ্না, অর্দ্ধনগ্না, পীবরস্তনী, শ্রোণিভারাদলসগমনা ইত্যাদি স্ত্রীমূর্ত্তিতে মাসিক পত্রগুলি পরিপূর্ণ। তরুণী স্রস্তবসনা নারীমূর্ত্তি ব্যতীত এজগতে যেন চিত্রিত করিবার আর কিছুই নাই। যে দীনদুর্ব্বল দেশে—শতকরা ৮০ জন নারী যৌবনেই বৃদ্ধা ও রোগজীর্ণা, সে দেশে ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা ছাড়া চিত্রে দেখাইবার মত আর কোন রমণী নাই! স্বীকার করি ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলারও স্থান আছে শিল্পে, কিন্তু তন্বীরও স্থান আছে। তরুণী নারীমূর্ত্তির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার করি,—কিন্তু বালিকা কিশোরী প্রৌঢ়া প্রবীণারও স্থান আছে। কন্যা, ভগিনী, কুললক্ষ্মী জননীর প্রতিমারও স্থান আছে। মাতৃমূর্ত্তি আঁকিয়া রাফেল অমর হইয়া গিয়াছেন। আঁকিলে অন্নপূর্ণার জরতীমূর্ত্তিও

রসসৌন্দর্য্যে মোহন হইয়া উঠিতে পারে। পূর্ণনগ্না মূর্ত্তিও পবিত্র হইতে পারে, শিল্পী যদি লালসার তুলি দিয়া না আঁকেন। যে দেশে শিল্পীরা জনসাধারণের রুচিকে উন্নত পথে পরিচালন না করিয়া তাহাদের জঘন্য রুচির শিকার জুটাইয়া অর্থার্জ্জন করিতে চাহে, সে দেশের আসন্ন দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া সত্যসত্যই শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ক্ষিতিবাবু দেশের এই দুর্দ্দিনে সমাজের কল্যাণকামনায় তাঁহার লেখনী ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পাঠকসম্প্রদায়কে অনুরোধ করি তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনাদের ভ্রান্তি বুঝুন এবং আপনাদিগকে ও ভাবিষ্যৎবংশীয়-গণকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করুন। লেখকদের কিছু বলিতে চাহি না; কারণ তাঁহাদের অনেকে দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থার্জ্জন করিতেছেন এবং কেহ কেহ আপনাদের শক্তিমত্তায় অন্ধ; তাঁহারা ক্ষিতিবাবুর এই চেষ্টাকে স্কুলমাষ্টারী বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। ক্ষিতিবাবুর সমস্ত বক্তব্যের সহিত সকলে যে একমত হইবেন ইহা আমি আশা করি না, তবে এই গ্রন্থে অনেক কথাই আছে যাহা তাঁহাদের চিত্তকে বিচলিত করিয়া তুলিবে। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের রুচি যেমনি হোক, তাঁহাদের কল্যাণকামনায় যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের নিকট অনাদৃত হইবে না। তবে লেখকগণের নিকট ইহা কিরূপ সমাদর লাভ করিবে তাহা "সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার" প্রতি ব্যবহারেই অনেকটা বুঝা গিয়াছে। মনস্বী মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কোন কোন সুধীব্যক্তির

ব্যঙ্গের পাত্র হইয়াছেন, এখন দেখা যাক্ ক্ষিতিবাবুর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হয়। সম্মিলনী—২০শে শ্রাবণ, ১৩৩০।

"Art O Sahitya"—(Art and literature)—This is a masterly little book (in Bengali) of literary criticism, Nowadays a theory is current among Bengali authors of cultivating art for art's sake without any regard to its effect on society. They say, beauty is the soul of art, and the creation of beauty is the duty of all artists. This unrestricted attempt to create beauty has in many cases produced indecorous books which have been praised by many, but have given pain to all thoughtful leaders of society. Mr. Tagore voices the disapprobation of the latter section in the present book. In a short compass he has dealt with the subject from different aspects and has successfully proved that beauty coupled with truth and good is the soul of art, but divorced from the latter two cannot be so, but becomes a source of degradation of the society. He therefore implores all authors to make a note of this fact, and to restrain their pens in such a way as not to place before the society any demoralising picture for the purpose

of creating beauty. The author by his attempt has become the object of praise of all well-wishers of the society and we wish his book wide circulation among our countrymen.

Devalaya Review—August 1923.

এ সময় দেশে একটা নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। একা নয়, সকলকে লইয়া উঠিব। ছোট বড় সকলকে লইয়া বড় হইব। শুধু শরীরসম্পর্কে নয়, শুধু আত্মাসম্পর্কে নয়, জীবনের সকল বিভাগের স্বাস্থ্যসাধন করিয়া, সকল বিষয়ে রোগমুক্ত হইয়া সবল হইব, বড় হইব।

মনের ব্যাধি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যাধি; মন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়, আত্মাও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। মনের ব্যাধি টানিয়া বাহির করা, সে ব্যাধির নিদান বুঝিয়া প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ ও মনকে ব্যাধিমুক্ত করা, মনকে সুস্থ করা এ সময়ের একটা বড় কাজ। নানারূপ মানসিক ব্যাধি নানা কারণ হইতে উপস্থিত হইয়া এদেশের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় জীবনকে ছোট করিয়াছে, শ্রীহীন করিয়াছে, নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়াছে। আর্টপ্রসূত কুরুচি, কুভাব-উত্তেজক চিত্র, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থ এদেশের ছোট বড় সকল শ্রেণীর নর-নারীর মনকে, বিশেষতঃ দেশের ভাবী আশাভরসার স্থল যুবকযুবতীদিগের মনকে কিরূপ ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছে, কিরূপ হীন করিয়াছে, শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে তাহা দেশের কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে অবগত আছেন; এজন্য কাহার প্রাণ না ব্যথিত? শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ

ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ তাঁহার প্রণীত "আর্ট ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে এই ব্যাধির অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। মানবমন ও মানবচরিত্রকে হীন করা ব্যাধিগ্রস্ত করা আর্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়; আর্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য মনের কল্যাণসাধন, মানবমনের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন, মানবমনের উন্নতি, ইহা তিনি এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে চিন্তাশীল সহৃদয় তত্ত্বনিধি মহাশয় দার্শনিক ভাবে অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় আর্টের প্রকৃত লক্ষ্য কি তাহা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হীনরুচি গ্রন্থকারদিগের প্রণীত গ্রন্থগুলির দ্বারা দেশে কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া এদেশের নাটক উপন্যাস লেখক লেখিকা এবং পাঠক পাঠিকাদিগকে এ বিষয়ে নব জাগরণ দিতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি,এই গ্রন্থখানি নীচ মন্দভাব-উত্তেজক চিত্র, নাটক, উপন্যাস, প্রভৃতির নূতন আমদানীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিতে বিশেষরূপে সমর্থ হইবে এবং যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এরূপ গ্রন্থ পাঠে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে সুস্থতা আনিবার উপায় বিধান করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে; এবং দেশে সার শিক্ষা লাভের পথে, শারীরিক মানসিক, আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাস্থ্য সামর্থ্য লাভের পথে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ঘরে ঘরে এ গ্রন্থ আদৃত হউক, গৃহীত হউক ও পঠিত হউক। আমরা সহৃদয় গ্রন্থকার মহাশয়ের এই গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রখানি আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের পাঠের ও অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

* * * ধর্ম্মতত্ত্ব—আষাঢ় ১৩৩০।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ মহাশয়, "আর্ট ও সাহিত্য" নামক এক নাতিবিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। অশ্লীলতা ও কুরুচির প্রবল বন্যায় বঙ্গসাহিত্য বিশেষতঃ বাঙ্গালার উপন্যাসসাহিত্য একেবারে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও চিন্তাশীল লেখক রায় যতীন্দ্র মোহন সিংহ বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে নির্ভীক-চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যতীন্দ্র বাবুর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক গ্রন্থ সেই প্রচেষ্টার ফল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐ পুস্তকের এক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বক্তব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল না বলিয়া "আর্ট ও সাহিত্য" নামক এই অভিনব ও উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত: সুতরাং নূতন করিয়া আর তাঁহার পরিচয় দিতে হইবে না। তিনি শ্রদ্ধাবান ও ভাবুক। তাঁহার রচনা সংযত ও চাপল্যবর্জ্জিত। তিনি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই। অনেক স্থলে মনে হইয়াছে, ভাষা আরও একটু তীব্র হইলে ক্ষতি ছিল না। কারণ, উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, অন্যান্য প্রথার ন্যায় রমণীর সতীত্বও একটা প্রথা (convention) মাত্র। পুরুষেরা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই সতীত্বের গুণ গান করিয়াছেন এবং স্ত্রীলোকদিগকে সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য করিয়াছেন; এবং এই সতীত্বধর্ম্ম পালন করাতে ভারতবর্ষে স্ত্রীচরিত্রের স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্মেষ হইতে পারে নাই। এ সব

পাঠ করিয়া ধৈর্য্য রক্ষা করা সম্ভব কিনা পাঠক মহাশয়েরাই বিচার করুন। গ্রন্থকার নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রত্যেক কথাই তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার রচনাও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

যে সূত্র অবলম্বন করিয়া এই অশ্লীলতা ও কুরুচি বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে তাহা এই,—art is to be cultivated for art's sake; অর্থাৎ কলাশিল্পের খাতিরেই কলাশিল্পের চর্চ্চা করিতে হইবে; সন্নীতি প্রচারের জন্য কলাশিল্পের অনুশীলন করা সঙ্গত নহে; সেরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে নাকি আর্টের আর্টত্ব নষ্ট হইয়া যায়। ইহার সহিত, আরেকটী ধুয়াও সংযোজিত হইয়াছে; তাহার নাম realistic বা 'প্রত্যক্ষদ্যোতক' আর্ট। ইউরোপ হইতে আমদানী করা এই সব সূত্র বা 'ফর্ম্মুলার' দোহাই দিয়া এদেশীয় সাহিত্যিকেরা দুর্নীতি প্রচারের সমর্থন করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার বলেন যে, ইহা এদেশীয় শিক্ষিত লোকদের slave mentality বা মানসিক দাসত্বের ফল। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ নাই। আমাদের যে চিন্তার স্বাধীনতা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। এস্থলে আমরা কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে, আর্টের খাতিরে আর্ট ও প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট এই দুই রোগের প্রভাবেই দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল সত্য; কিন্তু সম্প্রতি আবার একটী নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। তাহার নাম 'ইব্‌সেনিজম্'। বলা বাহুল্য যে, ইহাও ইউরোপ হইতেই আমদানী করা হইয়াছে এবং আমাদের slave mentalityর ফলেই এদেশে

নির্ব্বিচারে গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থোক্ত রোগদ্বয়ের প্রকোপের পরেও সাহিত্যের যা' একটুকু 'স্বাস্থ্য' অবশিষ্ট ছিল তাহাও এই নূতন রোগের আবির্ভাবে একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা সতীত্ব সম্পর্কে যে উদ্ভট মতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও অতিরিক্ত ইব্‌সেন্‌সেবাজনিত অজীর্ণতার উদ্গার বই আর কিছুই নহে। আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের সহিত 'ইবসেনিজমের' ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সকলগুলি না হউক, কতকগুলি আধুনিক উপন্যাস যে ইহা দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। সুতরাং আধুনিক উপন্যাসের দুর্নীতি-প্রবণতার বিচারপ্রসঙ্গে ইবসেনিজমের উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু গ্রন্থকার ইহার উল্লেখ করেন নাই। না করিলেও, তিনি আধুনিক উপন্যাসে স্বাধীন প্রেমের ছড়াছড়ির নিন্দা করিতে ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "আর্টের খাতিরে আর্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাঁধিবুলির দোহাই দিয়া অধিকাংশ লেখক "স্বাধীন" অর্থাৎ পরকীয়ামূলক প্রেমেরই চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, দেখা যায়। কিন্তু কৈ—তাঁহারা তো ঐ সকলের দোহাই দিয়া রমণীর মাতৃত্বে শ্রদ্ধার চিত্র ব্যক্ত করিবার নামগন্ধও করেন না।" করিবেন কিরূপে? রমণীর মাতৃত্ব ত ইউরোপে আদৃত নহে। যাহা ইউরোপে আদৃত নহে, তাহা যতই ভাল হউক না কেন, একেবারে অস্পৃশ্য। Slave mentality বলা হয় কি অকারণে? আমরা প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছিলাম যে 'নব্য [ইউরোপীয়] রমণীকে মাতৃসম্বোধন করিলে তিনি তাহা অপমানজনক বলিয়াই মনে করিবেন।' এ বিষয়ে

বর্ত্তমান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ঐ যে প্রফুল্লকে ভবানী পাঠকের মাতৃসম্বোধনে আশ্বাস প্রদান—উহা ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া ভারতবাসীই উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এ ভাব স্বাভাবিক নহে বলিয়া আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তথাকার অধিবাসীরা ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় একটী গল্প শুনিয়াছিলাম যে, এক গরীব কেরাণী তাঁহার প্রভু কোন ইংরাজের পত্নীর দয়ায় অভিভূত হইয়া তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিবার ফলে, সেই প্রভু ইংরাজের হস্তে সেই কেরাণীকে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।"

এই গ্রন্থের প্রথমাংশে গ্রন্থকার আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই আলোচনা করিতে হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আর্টের খাতিরে আর্ট প্রভৃতির দোহাই দিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার সমর্থন করা হইয়া থাকে। সুতরাং আর্ট কি তাহা বিচার করা আবশ্যক। যদি দেখা যায় যে যাহা কুৎসিত ও অস্বাভাবিক, অসত্য ও অশিব তাহা প্রকৃতপক্ষে আর্ট পদবাচ্য নহে; তবে আর্টের খাতিরে আর্টের অনুশীলন করিতে যাইয়া অশ্লীলতা ও দুর্নীতির অবতারণার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বা ওজুহাত থাকিতে পারে না। আর্টের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার ইহাই দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'সত্যং শিবং সুন্দরং'ই আর্টের কেন্দ্র। সত্যকে ছাড়িয়া আর্ট হইতে পারে না। মঙ্গলকে ছাড়িয়া আর্ট দাঁড়াইতে পারে না; সৌন্দর্য্য ও

থাকিবেই। কিন্তু সত্য ও মঙ্গল ছাড়িয়া একমাত্র সৌন্দর্য্য লইয়া আর্ট হইতে পারে না। আধুনিক উপন্যাসলেখকগণ একমাত্র সৌন্দর্য্যকেই আর্টের প্রাণ মনে করিয়া এবং আর্টের খাতিরে আর্ট এই সূত্রের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই হইল আর্ট সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মোটামুটী মত।

গ্রন্থকার আর্টের এই যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ নাই। কারণ, এই মত ঋষিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জগতের অধিকাংশ আস্তিক দার্শনিকের দ্বারা সমর্থিত। তবে গ্রন্থকার যে এ বিষয়টি নিঃশেষে আলোচনা করিতে পারিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। আর এরূপ গ্রন্থে তাহা আশাও করা যায় না। কারণ, এই গ্রন্থে এই বিষয়টী প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার সত্যং শিবং সুন্দরং এই বাক্যের 'সত্য' ও 'শিবের' যতদূর আলোচনা করিয়াছেন 'সুন্দরং'এর ততদূর করেন নাই। আমাদের মতে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আরেকটু আলোচনা হইলে ভাল হইত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "সৌন্দর্য্য বিকাশের মূল ভাবগুলি যে কি, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেগুলি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব।" সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে বোধ হয় এই বলা যায় যে, রসই সৌন্দর্য্য। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন যে, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং'; যে রচনায় রসসঞ্চার করে তাহাই কাব্য। বলা হইয়াছে যে, আর্টের লক্ষ্য ভগবান। তবে হরিনাম-স্তোত্রকেই শ্রেষ্ঠ আর্ট বলা হউক না কেন? না, তাহা বলিতে পার না, কারণ তাহাতে রসসঞ্চার হয় না।

দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্যও ভগবান বটে, কিন্তু উহাদিগকেও কাব্য বলা যায় না। কারণ দার্শনিক ও নীতিবিদেরা যুক্তি তর্ক ও বিচারের সাহায্যে ভগবানের. অনুসন্ধান করেন। ভগবানের যে আনন্দের দিক, তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও আনন্দানুভব এই দুইটী পৃথক জিনিষ। তবে আনন্দেরও প্রকারভেদ আছে। ইন্দ্রিয়ানুশীলনেও আনন্দ হয়, কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী ও পঙ্কিল, সেই জন্য নিকৃষ্ট। যে আনন্দ চিরস্থায়ী ও নির্ম্মল তাহাই উৎকৃষ্ট; কিন্তু সে আনন্দের মূল উৎস কোথায়? শ্রুতি বলিয়াছেন, 'রসো বৈ সঃ'। ভগবান রসস্বরূপ। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও আর্টিষ্টেরা এই রসই অনুভব করেন এবং জনসাধারণকে অনুভব করান। আর, এই রস অতীন্দ্রিয় ও চিরস্থায়ী বলিয়া তাঁহাদের রচনাও চিরস্থায়ী হয়। এই জন্যই কবি, ঋষি ও সাধকের মধ্যে পার্থক্য বড় অল্প; আর এই কারণেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ধর্ম্মগ্রন্থরূপেও পূজিত হইয়া থাকে। রামায়ণ ও মহাভারত কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য নহে; উহা ধর্ম্মগ্রন্থরূপেও ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত। গ্রিয়ারসন বলিয়াছেন যে, তুলসীদাসের রামায়ণ আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, ঐ কাব্য উত্তরভারতের বাইবেল। উহা লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাব্যপিপাসার ন্যায় ধর্ম্মপিপাসারও তৃপ্তিসাধন করিয়াছে এবং চিরকাল করিবে। এইরূপ কাব্যই চিরকাল আদৃত ও পূজিত হইবে। যে কাব্য শুধু পঙ্কিল ও কদর্য্য কামকলার বিভ্রমবিলাসে পরিপূর্ণ, সে কাব্যকে, আর্টের

খাতিরে আর্ট প্রভৃতি ফর্ম্মুলার সাহায্যে, উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে, সে চেষ্টার ফল চিরস্থায়ী হইবে না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইন্দ্রায়ানুশীলনজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী; উহা আপাতমনোরম কিন্তু পরিণামে বিষময়। মানুষের হৃদয় ঐরূপ সুখের দ্বারা চিরতরে আকৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ মানুষের হৃদয়ে এমন কিছু আছে যাহা ক্ষণিক অথবা ক্ষণভঙ্গুর সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তবে Epicurianismই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইত। এবং বোকাচিওর 'ডিকামেরণই' জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। যে কাব্যে পাপের বিবিধ প্রকার নির্লজ্জ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, আমাদের মতে, সেই কাব্যের কলাকৌশলকেও আর্ট বলা চলে, কিন্তু তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর আর্ট। গ্রন্থকারও যে তাহা একেবারে অস্বীকার করেন, তাহা নহে; যদিচ তিনি অন্যভাবে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রকৃত আর্টের লক্ষণ নির্দ্দেশ করতঃ গ্রন্থকার কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক উপন্যাসের সমালোচনা করিয়াছেন। এখানে তিনি কাহাকেও খাতির করেন নাই; বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথকেও না। তিনি লিখিয়াছেন, "বন্দেমাতরং গানের রচয়িতাও তাঁহার সুনীল আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল দেবী চৌধুরাণীর অনুরূপ আরও অনেক উপন্যাস লিখিবার পরিবর্ত্তে পঙ্কিল ডোবা হইতে বিষবৃক্ষ সংগ্রহ করিবার জন্য পঙ্কে ঝাঁপ দিলেন! হায় হায়! যে রবীন্দ্রনাথের দেশ-

হিতৈষণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই রবীন্দ্রনাথও রাজর্ষির ন্যায় ধূপধুনার মঙ্গল গন্ধবাহী উপন্যাস না লিখিয়া নষ্টনীড়, চোখের বালি প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন !"

অনেকেই একথা বলিয়া থাকেন যে, আধুনিক উপন্যাস একেবারে অপাঠ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থকার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আধুনিক উপন্যাসলেখকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে সাহিত্যমহারথীগণ ! দোহাই আপনাদের ! এইরূপ (অশ্লীল ও কুৎসিৎ) গল্পচিত্র প্রভৃতি প্রকাশের ফলে আপনাদের হস্তকণ্ডূয়নের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, আপনাদের যশস্পৃহা চরিতার্থ হইতে পারে বটে, এবং আপনাদের মনের উদারতারও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু এগুলি দেশের মৃত্যুর কারণ মরণবায়ু।" তিনি আরেক জায়গায় বলিয়াছেন, "তাঁহাদের (আধুনিক ঔপন্যাসিকদিগর) নিকট করযোড়ে নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের উপন্যাসে······ অপ্রকৃত চিত্র প্রকাশে বিরত হউন—নিজেদের মা, বোন, মেয়ে ও স্ত্রীকে দেহে ও মনে-প্রাণে অসতীরূপে গড়িয়া তুলিতে নিরস্ত হউন।" ঔপন্যাসিকেরা নিরস্ত হইবেন কি ?

আধুনিক লেখকদিগের রচনায় যে এইরূপ বিকৃতরুচি ও সত্য ও মঙ্গলভাবের অভাব দেখা যায় তাহার কারণ কি, গ্রন্থকার তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ইহা দেশব্যাপী অনুকরণপ্রিয়তা ও দাসভাবের (slave-mentalityর) ফল।.........আমরা ত স্পষ্টই দেখি যে, বঙ্গের অনেক একালের উপন্যাসলেখক, দেশবাসীর নিকটে তাঁহাদের

উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণ নূতন বা original বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিলেও সেগুলির অধিকাংশই পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুকরণে লিখিত। এমন কি, একালের অধিকাংশ উপন্যাস পড়িবার সময়, খুব অল্প কয়েকস্থল বাদ দিলে, মনে হয় যে, পাশ্চাত্য আধুনিক উপন্যাসলেখকদিগের গ্রন্থের অনুবাদ পড়িতেছি। দাসভাবের ফলেই এই সকল পাশ্চাত্য উপন্যাসের ভাবধারা—ভগবানকে অনাবশ্যকবোধে ছাঁটিয়া ফেলিবার ভাব—এদেশের ও একালের উপন্যাসে স্থায়িত্ব লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।"

গ্রন্থকার যে কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক উপন্যাসের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত দুই-এক স্থলে যে আমাদের মতভেদ নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাহা এত সামান্য যে, উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি না।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে একটী কথা না বলিয়া পারি না। গ্রন্থের ভাষা যে মর্ম্মস্পর্শী তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু গ্রন্থকার স্থানে স্থানে পশ্চিম বাঙ্গালার গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, তিনি লিখিয়াছেন, "অনেকগুলি (উপন্যাসই) দেশকে অধোগতির দিকে টানিয়া লইবার জন্য আড়েহাতে লাগিয়াছে। এই 'আড়েহাতের' অর্থ আমরা সম্যক বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপ গম্ভীর ও মার্জ্জিত রচনায় এই জাতীয় গ্রাম্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা অন্যায় মনে করি। ইহাতে যে কেবল ভাষার সৌষ্ঠব নষ্ট হয় তাহা নহে, ইহাতে গ্রন্থের বহুল প্রচারেরও বিঘ্ন হয়। পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোকেরা যদি কোন গ্রন্থের ভাষা না বুঝিতে পারে, তবে তাহারা সে বই পড়িবে কেন? কেবল

এই কারণেও গ্রাম্য ও অপ্রচলিত শব্দ বর্জ্জন করা আবশ্যক।

যাহা হউক, এই গ্রন্থ পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এই গ্রন্থ পড়িয়া লেখক ও পাঠকদিগের চৈতন্যের উদয় ও রুচির পরিবর্ত্তন হইলে দেশের ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ।

প্রতিভা—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩০।

র‍্যাভেন্‌সা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরম ভক্ত শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত এম-এ মহাশয় কটক হইতে তাঁহার ১৩৩১ সালের ৫ই বৈশাখের পত্রে লিখিয়াছেন:—

"মহাশয়, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বাবুর নিকট হইতে আপনার "আর্ট ও সাহিত্য" ১ খানি এবং "শান্তি" ১ খানি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে একবার "আর্ট ও সাহিত্যের" কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু নিজের পুস্তক না থাকায় ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তখন হইতেই কিন্তু পুস্তকখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠে জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব ও স্বর্গীয় পবিত্রতা দেখিয়া মনে বড় আনন্দ পাইয়াছিলাম।

"শান্তির" নামটি সুন্দররূপ সার্থক হইয়াছে। উহা পড়িতে পড়িতে হৃদয়তন্ত্রী আপনি বাজিয়া উঠে, এবং সাধনার ধন দয়াল প্রভুর দিকে চিত্ত বেগে আকৃষ্ট হয়। এই ত প্রকৃত সৎসঙ্গ; এই পদ্যগুলির মধ্য দিয়া সাধকের পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। প্রভু এই পুস্তকের দ্বারা দেশের ভাইভগিনীদের চিত্ত আকর্ষণ করুন, ইহাই আন্তরিক কামনা। পদ্য কয়েকটি

পাঠ করিয়া যাহা মনে উদিত হইল নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলি-লাম, প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।'

মায়ে-পোয়ে—রয়াল ১৬ পেজী আকারের ॥০+৮০+১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

যার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নাই, তার সঙ্গে যে-কোন সম্পর্ক পাতানো চলে। শাদার উপরে সব রঙই ফলানো যাইতে পারে। তাই সেই চিররহস্যময়ের সঙ্গে মানুষ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নানা সম্পর্ক স্থাপন করে।

উপনিষদ্ যাহাকে "বামনী" "ভামনী" ও "সংযদ্‌বাম" কহিয়াছেন তাহার সঙ্গে রস যখন বেশী জমায়েৎ হইয়া উঠে মানুষ তখনই তাঁহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ অনুভব করে। এই অনুভূতিটাকে বেশি করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে একটা সম্পর্কে পরিণত করে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সম্বন্ধটাকে মাতা-পুত্রের ভাবের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার "মায়ে-পোয়ে"।

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"মা লিখাইয়াছেন, আমি লিখিয়াছি।" এই খানেই তো কবিত্বের চরম এবং সমা-লোচনার শেষ। তাঁহার লেখনী সার্থক হউক।

ব্রাহ্মসমাজের ভিতর এমন কেহ থাকিতে পারেন, যাঁহার কাছে এই "মায়ে-পোয়ে" একটা সাকার উপাসনার চরম—অর্থাৎ প্রায় প্রতিমাপূজার কাছাকাছি বলিয়া মনে হইতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তির জন্য বলা যাইতে পারে যে তিনি যেন এই পুস্তকখানির "সন্ধ্যায়" পরিচ্ছেদটী মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন। যেখানে লেখক কহিয়াছেন—"মায়ের

খোঁজে এসে যে এমন শোভা দেখতে পাব, তা কে জান্‌তো? এত শোভা তো দেখ্‌ছি, কিন্তু মায়ের অরূপ রূপের যে শোভা দেখেছি তার কাছে এত শোভাও কিছুই নয়।" বৈদিক ঋষিগণ প্রথমতঃ সুন্দর জগতের যাহা কিছু মনোরম দেখিতে লাগিলেন, তাহাকেই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন "এই সেই।" দেখিতে দেখিতে অবশেষে উপলব্ধি করিলেন যে "নেদং যদিদমুপাসতে"। এই জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই চিরসুন্দরকে চিনিতে হইবে; এই জাগতিক ব্যক্তিগণের সহিত যত রকম সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে আনন্দময়ের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ। নতুবা সেই অচিন্ত্য অপার অগম্যকে কি করিয়া বুঝিব?

এই "মায়ে-পোয়ে" ভাবের ধারার ভিতরে দেখিতে পাই "জ্বালা" আছে, "অভিমান" আছে, "আত্মসমর্পণ" আছে। অবশেষে সকল "আনন্দে" পর্য্যবসিত। সাধকের জীবন কত বিচিত্র ভাবের মধ্য দিয়াই না অগ্রসর হয়। ভাষা তাহাকে আর কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে?

যাহার জীবনে অরূপের রূপ-জ্যোতির সন্ধান মিলিল না— তার কিছু দেখাই হইল না। চিরসুন্দরকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে বলিয়াই জগৎ সুন্দর। যে ইহাকেই চরম ভাবিল, সে বড়ই ঠকিল। যে বালক খেলানা পাইয়া তাহাতেই মজিল, তাহার আর মায়ের কোলে যাওয়া হইল কৈ?

স্তরপরম্পরাক্রমে উক্ত ভাবগুলিকে সরল ভাষায় ফুটাইয়া তোলাই এই পুস্তিকার বিশেষত্ব। এই মর্ম্মোত্থিত ভাব-

গুলি যেন সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত, সাধনার সাহচর্য্যে শুভ্রোজ্জ্বল, এবং অনুভূতির আবেগে কম্পিত—একখানি ক্ষুদ্র গদ্যকাব্য।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নব্যভারত—কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৭।

১ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—আদিব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ কর্তৃক বিরচিত এবং 'আলো ও ছায়া' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায়, বি-এ মহোদয়া লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। পৃঃ ১/০+৩+২০+১৬০। মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে ১৫টি অধ্যায়; আলোচ্য বিষয়—(১) ভগবানের আশ্বাসবাণী, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী, (৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা, (৪) সত্যধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম, (৫) ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি, (৬) ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ, (৭) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ (অন্তরে), (৮) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ (বাহিরে), (৯) সঙ্কটমোচন, (১০) মামেকং শরণং ব্রজ, (১১) ঈশ্বর ও মানব, (১২) ঈশ্বর মঙ্গলময়, (১৩) ঈশ্বর বিশ্ববিধাতা, (১৪) মাতৃপূজা, (১৫) ঈশ্বর অন্তর্যামী।

গ্রন্থ সুলিখিত। গ্রন্থকার উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাই উপকৃত হইবেন।

কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই।

প্রথমতঃ তিনি গীতার দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন, "যখনই এবং যেখানেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় অধর্ম্ম সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহে, তখনই এবং সেখানেই সাধুদিগের রক্ষার জন্য এবং অসাধুদিগকে বিনাশ করিয়া

ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগবান প্রয়োজন-মত সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন।" পৃঃ ১।

ভগবান অসাধুদিগকে বিনাশ করেন। এ মতকে উচ্চাদর্শসম্মত বলিতে পারি না। আর তিনি 'সময়ে সময়ে' আত্মপ্রকাশ করেন এ মতও সত্য নহে। সর্ব্বকালে তাঁহার প্রকাশ।

বীজমন্ত্র—ব্রাহ্মধর্ম্মের 'বীজ মন্ত্র' বিষয়ে গ্রন্থকার এইপ্রকার লিখিয়াছেন—

"ঋষিরা যে-সকল সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সকলের মূলবীজ হইতেছে—বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, নিরবয়ব, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দময়, অমৃতময়, শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনরূপ একমাত্র তাঁহারই উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। এই বীজমন্ত্রের উপরই 'অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান।" (৫৩-৫৪)

গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই। কিন্তু অপর স্থলে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি হইল একেশ্বর-বাদ।" (পৃঃ ২ নিবেদন)।

ভারতবর্ষে বহু লোকে বহু দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে; এইজন্যই ব্রাহ্মগণ একেশ্বরবাদের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। কিন্তু একেশ্বরবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি বলিলে ভুল করা হয়। জগতে বহু শ্রেণীর একেশ্বরবাদ আছে—সে-সমুদয় একেশ্বরবাদকে আমরা গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করি না। যদি দেখি কোন একেশ্বরবাদের

ঈশ্বর ক্রোধ-হিংসা-বিদ্বেষাদিতে পূর্ণ এবং অশুদ্ধ ও পাপবিদ্ধ, তাহা হইলে এইপ্রকার একেশ্বরবাদকে আমরা বর্জ্জন করি। এই প্রকার 'একেশ্বর' অপেক্ষা প্রেম-পবিত্রতা-পূর্ণ বহু দেবতাও শ্রেষ্ঠতর। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ইহা একটি নিতান্ত সাধারণ সত্য। কিন্তু যদি বলা হয় ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি, তাহা হইলে প্রকৃত কথা বলা হয় না। ঈশ্বরের যাহা 'স্ব-রূপ' তাহার অপরাপর দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ঈশ্বর সংখ্যায় এক, কেবল এই দিকে ঝোঁক দিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি প্রকৃত ভাবে বর্ণনা করা হয় না।

লক্ষ্য—ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য কি? কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে? গ্রন্থকার বলেন—:

"সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা হইতে অধর্ম্মের করাল কবল হইতে মুক্তি দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হইয়াছে" (১৩)।

"প্রাচীন পন্থাকে সংস্কৃত করিয়া তাহাতে নবীনযুগের নবীন আলোক, নবীন ভাব প্রবেশ করাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির নবতর পন্থা দেখাইতে চাহেন" (১৯)।

"একদিকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য, অপরদিকে সংশয়-সন্দেহ হইতে মুক্তি দিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব" (২১)।

"ভগবান সমগ্র জগতকে পরাধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্যই.........ব্রাহ্মধর্ম্মকে......পাঠাইয়াছেন" (৩)।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন আসিয়াছে?

"মুক্তি দিবার জন্যই"। ইহার অর্থ "মুক্তি দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য"।

কিন্তু আমাদিগের মনে হয় মুক্তিই ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ কথা নহে। যাঁহারা মনে করেন "মানবাত্মাই ব্রহ্ম"—তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহাদের মতে সংসারাবস্থা বন্ধনের অবস্থা; বন্ধন মোচন কর, মানব আবার ব্রহ্মই হইবে; মুক্তির অবস্থাই ব্রহ্মাবস্থা। কিন্তু গ্রন্থকার এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকলেই বলেন, মানবাত্মা সৃষ্ট এবং অনন্ত উন্নতিশীল। মানবাত্মা ব্রহ্মত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইবে, কিন্তু কখনই 'স্বরূপ' বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিবে না এবং ব্রহ্মে লীন হইবে না। এই মানবাত্মা নানাপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে; এসমুদায় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে। কিন্তু বাধা-বিঘ্ন, শোক-তাপ, দুর্গতি-দুর্ম্মতি প্রভৃতি হইতে মুক্তি লাভ করিলেই যে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ হইল তাহা নহে। মুক্তিলাভের পর অগ্রসর, আরও অগ্রসর। মুক্তাত্মা প্রীতি ও ভক্তিতে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে দিন-দিনই অগ্রসর হইতে থাকেন; তিনি নিজের কেন্দ্রকে ব্রহ্মের কেন্দ্রের সহিত একীভূত করেন এবং দিন-দিনই আত্মার পরিধিকে বিস্তৃত করেন। ব্রহ্ম যে চক্ষুতে জগৎকে দর্শন করেন, তাঁহার লক্ষ্য তিনিও যথাসম্ভব সেই চক্ষুতে জগৎকে দর্শন করিবেন। ব্রহ্ম যে-ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করেন তাঁহার লক্ষ্য, তিনিও যথাসম্ভব সেই-ভাবে জগতের কল্যাণসাধন করিবেন। তাঁহার লক্ষ্য তিনি সর্ব্বাবস্থাতে ব্রহ্মকে অনুভব করিবেন এবং ব্রহ্মের সহিত যুক্ত থাকিয়া ব্রহ্মকে এবং জগৎকে সম্ভোগ করিবেন।

অপরাপর মুখ্য বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই। শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ প্রবাসী—আশ্বিন ১৩২১।